লালন শাহের গান : তত্ত্ব-দর্শন ও শিল্পরূপ

মোঃ শফিউল ইসলাম ভূঁইয়া

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি
ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

জুন, ২০১৪

Dhaka University Institutional Repository

লালন শাহের গান : তত্ত্ব-দর্শন ও শিল্পরূপ

মোঃ শফিউল ইসলাম ভূঁইয়া

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ।

জুন, ২০১৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন-পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, মোঃ শফিউল ইসলাম ভূঁইয়া, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হিসেবে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য আমার তত্ত্বাবধানে 'লালন শাহের গান : তত্ত্ব-দর্শন ও শিল্পরূপ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি প্রণয়ন করেছেন। গবেষণাটি মৌলিক তথ্যের ভিত্তিতে, বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেন নি।

(ড. ওয়াকিল আহমদ)
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
প্রাক্তন অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
প্রাক্তন উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রসঙ্গ-কথা

সার-সংক্ষেপ

প্রথম অধ্যায় : ফকির লালন শাহের আবির্ভাবকাল ও জীবন-কথা ১

দ্বিতীয় অধ্যায় : লালন শাহের গানের প্রকৃতি, তত্ত্ব ও দর্শন ২৪

তৃতীয় অধ্যায় : লালনের গানের ভাব, ভাষা ও আঙ্গিক কাঠামো ৪৫

চতুর্থ অধ্যায় : লালন-গীতির শিল্পসৌন্দর্য ৬০

পঞ্চম অধ্যায় : উপসংহার ৮১

গ্রন্থপঞ্জি ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ-কথা

বাঙালির মরমি ভাবজগতের অনন্য পুরুষ বাউল শিরোমণি লালন শাহ (১৭৭৪-১৮৯০) প্রায় দুই শত বছর ধরে আমাদের ধ্যানে, জ্ঞানে, মন-মননে ও অধ্যাত্ম সাধনায় নিরবচ্ছিন্ন অনুপ্রেরণা দিয়ে আসছেন। তাঁর গানের বাণী, সুর, দর্শন-তত্ত্ব ও শিল্পশীলিত অবয়ব স্বতঃই যে বোধের সঞ্চার করেছে তা থেকেই 'লালন শাহের গান : তত্ত্ব-দর্শন ও শিল্পরূপ' শীর্ষক বিষয়ে অভিসন্দর্ভ রচনার প্রয়াস। মূলত আমরা অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি যে তাঁর মত একজন স্বভাব কবির রচনা—সুর-ছন্দের দোলায় আকর্ষণীয় হতে পারে, বাণী মহামান্বিত হতে পারে এবং শিল্পবোধে জীবন ও সংস্কৃতির বিশিষ্ট আধেয় হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। এছাড়াও তাঁর গান বাঙালির প্রাণ ছুঁয়ে বহির্বিশ্বে স্থান করে নিয়েছে যা বঙ্গসংস্কৃতিতে প্রতিনিধিত্বশীল ভূমিকা রাখছে। শান্তিময় বিশ্ব বিনির্মাণে অনিবার্যভাবে তাঁর দর্শনে আমাদেরকে পৌঁছতে হয়; মানুষ আর মানুষের ভেদাভেদহীন পৃথিবীতে তাঁর আহ্বান শাশ্বত। তাই তাঁর গান ও জীবন জন্ম দিয়েছে নানাবিধ জিজ্ঞাসা এবং গবেষণার প্রসঙ্গ।

অবশ্য ইতোপূর্বে লালন জীবন ও গান নিয়ে গবেষণা-কর্ম নানাভাবে সম্পাদিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই সর্বপ্রথম লালনের গানের তত্ত্ব-দর্শন নিয়ে দেশে-বিদেশে আলোচনা শুরু করেন। এরপর মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন লালনের গান সংগ্রহ করে আলোচনায় আসেন, ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বাউল বিষয়ক আলোচনার সঙ্গে লালনের গান ও তত্ত্ববিষয়ক আলোচনা করেন। পরবর্তীতে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, ড. আহমদ শরীফ, মুহম্মদ আবদুল হাই, মতিলাল দাস প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তি বাউলতত্ত্ব আলোচনাসহ লালনের গানের আলোচনা অব্যাহত রাখেন। অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম, এস. এম. লুৎফর রহমান, খোন্দকার রিয়াজুল হক, ড. ওয়াকিল আহমদ, সনৎকুমার মিত্র, শক্তিনাথ ঝা, আবুল আহসান চৌধুরী প্রমুখ বিদগ্ধ গুণীজন লালন নিয়ে ব্যাপক পরিসরে গবেষণার অবতারণা করলেও সংগ্রহ ও সম্পাদনার দিকে অধিক মনোযোগ লক্ষ্য করার বিষয়। অবশ্য যুগপৎ লালনজীবনী ও তত্ত্ব-দর্শন এবং শিল্প বিষয়ক আলোচনা খুব একটি বেশি হয়নি। বিধায় আলোচ্য অভিসন্দর্ভটি এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমাদের প্রত্যয়।

প্রথম অধ্যায় : 'ফকির লালন শাহের আবির্ভাব কাল ও জীবন-কথা'য় লালন শাহের আগমনের পূর্ববতী সময়ে আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় অবস্থার কথা তুলে ধরার সঙ্গে তাঁর সময়কালেরও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট আলোচনায় এসেছে। আর জীবন-বৃত্তান্তে যদিও কোন নতুন তথ্য সংযোজন করা যায়নি, তথাপি পূর্ববর্তী তথ্য-উপাত্তের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ দ্বারা লালন জীবনীর কিছু মোড় পরিবর্তনকারী বিষয়ে মতামত প্রদান করে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বৃত্তান্ত উপস্থাপিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : 'লালন শাহের গানের প্রকৃতি, তত্ত্ব ও দর্শন' অংশে লালনের গানের একান্ত স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে। তাঁর গানের মূল ভিত্তি যে তত্ত্ব, তার স্বরূপ সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে এবং দর্শন সংক্রান্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : 'লালনের গানের ভাব, ভাষা ও আঙ্গিক কাঠামো'। এখানে বস্তুত তাঁর গানগুলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গানের ভাবের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। ভাষা সংক্রান্ত বিষয়ে ভাষাবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গানের আঙ্গিক কাঠামোতে আমরা এর রূপ-স্বরূপসহ সুর-ছন্দে এবং সংগীতশাস্ত্রের মাপকাঠিতে বিচার-বিবেচনার চেষ্টা করেছি।

চতুর্থ অধ্যায় : 'লালন-গীতির শিল্পসৌন্দর্য'। এই অংশে ভাব, ভাষা, ছন্দ, অলংকার, চিত্রকল্পসহ শিল্পমূল্যের বিবেচনায় বিচিত্র অনুসঙ্গ নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : 'উপসংহার' অংশে বর্তমান গবেষণা প্রাপ্ত চিন্তা- চেতনা এবং প্রেরণাকে গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং সর্বশেষে গ্রন্থপঞ্জি সংযুক্ত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এ গবেষণা কর্মে আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট ফোকলোরবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, কলা অনুষদের ডিন, প্রো-ভিসি এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, ওয়াকিল আহমদ (পিএইচ-ডি, ডি-লিট) যে অক্লান্ত আগ্রহে তত্ত্বাবধান করেছেন এবং শত ব্যস্ততার মধ্যেও লালন-ভাবনাকে যুগোপযোগী পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়ে সঞ্চালিত করেছেন তাঁর এ ঋণ আমার কাছে অপরিশোধ্য। বাংলা বিভাগের প্রাক্তন সভাপতি শ্রদ্ধাভাজন ড. আবুল কাশেম ফজলুল হক যে প্রেরণা দিয়েছেন তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক ড. আব্দুর রহমান সিদ্দিকী গবেষণাকর্ম চালিয়ে যেতে তাগিদ দিয়েছেন, পরামর্শ দিয়েছেন, সর্বোপরি অভিভাবকতুল্য উৎসাহ আর অনুপ্রেরণা দিয়ে আমাকে প্রাণিত করেছেন; আমি তাঁর কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। আমার শিক্ষক ড. খোন্দকার ফরহাদ হোসেন, অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, গবেষণা ব্যাপারে যে উৎসাহ প্রদান করেছেন তা চিরস্মরণীয়। ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক ড. শহীদুর রহমানের কাছ থেকে পেয়েছি নিরন্তর তাগিদ। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাবা আব্দুল করিম (খেলাফতধারী পীর) এবং মা ফেরদৌসী করিম লালনসংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনার সুযোগ দিয়ে এবং বই-পত্র দিয়ে আমাকে নানাভাবে গবেষণা কর্মে উৎসাহিত করেছেন, এজন্য তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। লালনের গানের আলোচনায় উপকৃত হয়েছি প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী ফরিদা পারভীনের কাছ থেকে, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গবেষণা নির্বাহকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাকার ও বাংলা বিভাগীয় সেমিনার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও ফোকলোর বিভাগীয় সেমিনার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, জাতীয় গণগ্রন্থাগার, ঢাকা, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গ্রন্থাগার, ঢাকা, ব্যবহার করেছি। এসব প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সুহৃদ ড. রোকোনুজ্জামান, সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ভোলা সরকারী কলেজ, ভোলা এবং মো. বশির আহমেদ, সহকারী অধ্যাপক, বাংলাবিভাগ, গোবিন্দগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ, গাইবান্ধা, ছমির আমিনুল, অধ্যক্ষ, নাগেশ্বরী বি.এম কলেজ, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম; তিনজনকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাঁরা আমার গবেষণা-কর্মকে চালিয়ে যাবার নিরন্তর প্রেরণা দিয়েছেন। এছাড়াও বাংলা একাডেমির তরুণ কবি, নাট্যকার ও গবেষক বন্ধুবর সাইমন জাকারিয়া গবেষণা-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বন্ধুত্বের মর্যাদা ম্লান করতে চাই না। গবেষণার মুদ্রণের কাজে অগ্রজ প্রতীম এমদাদুল হকের সহায়তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

মো. শফিউল ইসলাম ভূঁইয়া

লালন শাহের গান : তত্ত্ব-দর্শন ও শিল্পরূপ

সার-সংক্ষেপ : লালন শাহ (১৭৭৪-১৮৯০) তাঁর সাধনা এবং সংগীতের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বাউল সাধনার এক শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার হিসেবে। বাউল গানের উদ্ভবের ইতিহাস আগের হলেও এর হদিশ খুব একটা মেলেনি। যদিও ক্ষিতিমোহন সেন 'প্রাচীন বাউলের' অমূল্য গান সংগ্রহ করেছিলেন যা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু এর অকৃত্রিমতা নিয়ে অনেকের প্রশ্ন থেকে যায়। সেদিক দিয়ে লালন সাঁই-ই প্রথম ও প্রধান বাউল পদকর্তা।[১] আর এ জন্যই বাউল সাধক, গানের স্রষ্টা এবং শ্রেষ্ঠ রচয়িতা হিসেবে তাঁর নামটি অনবদ্য।

'লালন শাহের গান : তত্ত্ব-দর্শন ও শিল্পরূপ' শিরোনামে এ অভিসন্দর্ভে 'বিশ্লেষণমূলক গবেষণা পদ্ধতি' অনুসরণ করেছি। লালনের গান, বাউল বিষয়ক বই-পুস্তক ও লালন বিষয়ক রচনা পাঠ এবং বিশেষ ক্ষেত্রে বাউল ও লালন ঘরানার কতিপয় ঋদ্ধ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি। যথাযথ তথ্য-উপাত্ত বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে মোট পাঁচটি অধ্যায়ে অভিসন্দর্ভটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় : 'ফকির লালন শাহের আবির্ভাবকাল ও জীবন-কথা' : কোম্পানি আমলে শাসকশ্রেণির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শাসন-শোষণ-নির্যাতনে বাংলার জনজীবনে ঘোর অমানিশা নেমে আসে। পলাশীর যুদ্ধের পর মাত্র ১২ বছরের মাথায় 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে'র মতো এক মহা দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে দেশের এক তৃতীয়াংশ মানুষ প্রাণ হারায়। এর উপর নিত্য-নতুন করের চাপে দেশের ধনী-নির্ধন সকল শ্রেণির জীবন পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। সমাজের এরূপ তমসাচ্ছন্ন অবস্থায় পল্লীর এক প্রান্তে লালন শাহের আবির্ভাব হয়। লালন শাহের জীবন কাহিনী নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। লালনের জন্মস্থান, জন্মতারিখ, নাম, পিতা-মাতার নাম, পরিচয়, বংশ-পরিচয়, লালন-স্ত্রী, তীর্থযাত্রা, ব্যাধি, লালন বাউল না সুফি, লালন-প্রতিকৃতি, রবীন্দ্রনাথ ও লালনের প্রত্যক্ষ দেখা-সাক্ষাৎ এ বিষয়গুলিই নানাভাবে নানা মতে আবর্তিত হয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে লালনের সময়ে এবং তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত নির্ভরযোগ্য রচনা থেকে একটি প্রামাণিক জীবনী নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : 'লালন শাহের গানের প্রকৃতি, তত্ত্ব ও দর্শন' : এখানে লালনের গানের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর গানের মূলভিত্তি ছিল তত্ত্ব। লালন সংগীতের প্রধানত সাতটি তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। বাউল সংগীতে আত্মদর্শন, জীবদর্শন, অধ্যাত্মদর্শনের কথা থাকলেও লালন মানবতাবাদেরই জয়গান করেছেন, যা তাঁর গানকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে। বাউল তথা লালনের গান বিশ্বলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। জাতিসঙ্ঘের ইউনেস্কো বাউল গানকে 'a masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity' হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এ অধ্যায়ে এ বিষয়ে সামগ্রিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : 'লালনের গানের ভাব, ভাষা ও আঙ্গিক কাঠামো' : এ অধ্যায়ে লালন শাহের গানের ভাবের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। ভাষা পর্যায়ে তাঁর গানগুলোকে ভাষাবিজ্ঞানীদের

---

১. ফকির আনোয়ার হোসেন (মন্টু শাহ) সম্পাদিত—লালন সংগীত ১ম খণ্ড, কুষ্টিয়া : ১৯৯৩, পৃ. ভূমিকা (আবুল আহসান চৌধুরী রচিত)

দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষিত হয়েছে। গানের আঙ্গিক কাঠামো আলোচনায়—এর রূপ-অবয়ব, সুর-ছন্দ, রাগ-রাগিণী নিয়ে সংগীত-বিশারদদের মতামত গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : 'লালন-গীতির শিল্পসৌন্দর্য' : লালনের গানের ভাব, ভাষা, ছন্দ, অলংকার, প্রবাদ-প্রবচন-সুভাষণ, চিত্রকল্পের দৃষ্টান্তসমূহকে শিল্পমূল্যের মানদণ্ডে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে শিল্প-সৌন্দর্য নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে তত্ত্ব ও দর্শনকে শিল্পমণ্ডিত রূপ দান সহজসাধ্য বিষয় ছিল না। লালন শাহ ছিলেন স্বভাবশিল্পী; তাঁর গভীর বিষয়-জ্ঞান, ভাববোধ ও প্রকাশভঙ্গি তাঁকে শিল্পসাফল্য এনে দিয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : 'উপসংহার' অংশে গবেষণা-প্রাপ্ত চিন্তা-চেতনা ও প্রেরণাকে গ্রহণ করে কতক প্রস্তাব যেমন—লালনের গান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং দেশে-বিদেশে প্রচার-প্রসার ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং সর্বশেষ গ্রন্থপঞ্জি সংযুক্ত হয়েছে।

(মোঃ শফিউল ইসলাম ভূঁইয়া)
পিএইচ-ডি গবেষক
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৯-২০১০
রেজিস্ট্রেশন নং-১৯
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

প্রথম অধ্যায়

ফকির লালন শাহের আবির্ভাবকাল ও জীবন-কথা

১৭৬৫ সালে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি লাভের পর থেকে গ্রাম-বাংলায় লুটপাট শুরু হয় এবং এরূপ লুটপাটের ফলে কৃষকরা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে এবং ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, যা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' হিসেবে এক কাল-অধ্যায়ের সৃষ্টি করে এবং অন্যান্য অঞ্চলের মতো বৃহত্তর যশোর-কুষ্টিয়া ও খুলনা জেলার কৃষকের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কৃষক-প্রজা পুরোপুরি ভূমিহারা, গৃহহারা হয়ে প্রায় পথে বসেন।[১] অবশ্য এরূপ অবর্ণনীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সে সময় সশস্ত্র প্রতিবাদ-সংগ্রাম শুরু হয়। সে সময়কার প্রতিবাদ সংগ্রামের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে 'ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' (১৭৬৩-১৮০০)। এই বিদ্রোহ ব্রিটিশ বেনিয়াদের সীমাহীন অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণ, ধর্মীয় অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র প্রতিবাদ।

বাংলায় নীলবিদ্রোহ সংঘটিত হয় দীর্ঘকালব্যাপী। এর প্রথম পর্যায় (১৭৭৮-১৮০০) এবং দ্বিতীয় পর্যায় বা চূড়ান্ত পর্যায় (১৮৫৯-১৮৬১)। নীলকুঠি সাহেবরা শোষণ ও শাসনের হাতিয়ার হিসেবে কুঠি স্থাপন করতে থাকে তেমনি স্থানীয় কৃষক সমাজও এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে থাকে।[২] বস্তুত ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির অনুমতি লাভ করে ইউরোপীয় বণিকগণ এদেশে কিছু জমিদারকে প্রলুব্ধ করে তাদের প্রজাদের দ্বারা নীল চাষে বাধ্য করে। এবং প্রায় প্রতিটি জায়গায় নীলকুঠি স্থাপন করে কৃষকদেরকে জমিদার এবং জোতদারদের কাছ থেকে দাদন গ্রহণে বাধ্য করা হয় এবং এ দাদনের টাকা কৃষকগণকে বংশ পরম্পরায় শোধ করতে হয়। এরূপ জুলুম-অত্যাচারের বিরুদ্ধে নীলচাষীরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করেন এবং ক্রমশ এ আন্দোলনের মাত্রা বেড়ে যায় এবং বিদ্রোহের রূপ নেয় যা নদীয়া, যশোর, বারাসাত, পাবনা, রাজশাহী, মালদহ, ফরিদপুরসহ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বাংলার অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর এবং তা ছিল প্রকৃতির মর্জির উপর; তারপরেও কৃষক যে ফসল ঘরে তুলে তার আবার চৌদ্দ-পনেরো আনা চলে যায় রাজস্ব ও সুদসহ দেনা পরিশোধ করতে। এরূপ পরিস্থিতিতে কৃষকের জীবনে চরম দরিদ্রতা নেমে আসে এবং শেষ পরিণতি হিসেবে কৃষকবিদ্রোহ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

একদিকে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে ব্রিটিশ বেনিয়াদের শাসন-শোষণ এবং ষড়যন্ত্র ও তার প্রতিবাদ অন্যদিকে অধ্যাত্ম জীবনে নানা পরিবর্তনের এক সন্ধিক্ষণে বাংলার বাউল সাম্রাজ্যের শিরোমণি, বাঙালি মরমি ভাবজগতের উজ্জ্বল তারকা ফকির লালন শাহের আবির্ভাব ঘটে। এ মহান ব্যক্তি সে সময়কার ভুখা, সর্বস্ব হারানো দেহসর্বস্ব মানুষকে শুধুমাত্র দেহকে ভুবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন হিসেবে এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ধ্যানে, জ্ঞানে ও সাধনায় পরম স্রষ্টার কাছে সমর্পিত করার মহান আহ্বান জানালেন। আজ নানাবিধ কারণে এ মহান মনীষীর অধ্যাত্মজীবন থেকে শুরু করে একান্ত ব্যক্তিজীবনের অসংখ্য ঘটনাবলি জানার তীব্র বাসনা বিশ্বব্যাপী তোলপাড় করছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমাদের যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে। লালন শাহ রয়ে গেছেন ইতিহাসের তিমিরে। ব্যক্তিলালন তাঁর সাধক জীবনের বাইরে এত নীরব ছিলেন যে তাঁর একান্ত শিষ্য সম্প্রদায়ও তাঁর ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে খুব বেশি অবগত হওয়ার সুযোগ পাননি। মূলত, তৎকালীন সামাজিক প্রতিকূলতায় গভীর তত্ত্ব-দর্শন ও সাধন প্রণালী গানে গানে প্রচার করাই ছিল প্রধান কাজ। এরূপ পরিস্থিতিতে লালনের ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে প্রামাণ্য কোন তথ্য-উপাত্ত খুব বেশি পাওয়া যায়নি। সাধক লালন শাহের এরূপ আত্মনিমগ্ন এবং সংসারনির্লিপ্ত রহস্যাবৃত জীবন-কাহিনী থেকে তত্ত্ব-তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহে যাঁরা অভিযান চালিয়েছেন, পূর্ববর্তী কয়েকজন গবেষক-পণ্ডিত ব্যক্তির প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাতেই হবে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন—কাঙাল হরিনাথ, মীর মশাররফ হোসন, রাইচরণ দাস, সরলা দেবী, মৌলবী আবদুল ওয়ালী, বসন্তকুমার পাল, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

---

১. জুলফিকার হায়দার, বাংলার সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম, ঢাকা : অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৫৪

২. মাসুদ রেজা, ফরিদপুরের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপরেখা, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৮, পৃ. ২০

লালনের অধ্যাত্মজীবন এবং ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়—পাক্ষিক হিতকরী পত্রিকার উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ থেকে। লালনের মৃত্যুর (১৮৯০ সালের ১৭ই অক্টোবর) অব্যবহিত পরে ১২৯৭ সালের কার্তিকে ১ম ভাগ এবং ১৩শ সংখ্যায় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। তবে এটি কার রচনা এ ব্যাপারে কোন উল্লেখ না থাকায় অনুমান করা হয় মীর মশাররফ হোসেন কিংবা রাইচরণ দাসের রচনা হতে পারে। কেননা তাঁরা একাধারে এ পত্রিকার এরূপ নিবন্ধ রচনা করতেন এবং পত্রিকা প্রকাশে সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণ করতেন। তবে এ ব্যাপারে ঐতিহাহিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের উক্তিটি অনেকটা প্রণিধানযোগ্য। তিনি উল্লেখ করেছেন—'কুষ্টিয়ার উকিল বাবু রাইচরণ বিশ্বাস (দাস), কুমারখালীর খ্যাতনামা হরিনাথ মজুমদার ও তাঁহার ফিকিরচাঁদের দলস্থ লোকেরা লালনের অনেক গান জীবনের অনেক ঘটনা জানেন...।'[৩] প্রবন্ধটি যখন প্রকাশিত হয়, তখন মীর মশাররফ হোসেন কুষ্টিয়ায় ছিলেন না, তিনি অবস্থান করছিলেন টাঙ্গাইলে। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে লালনের মৃত্যুর পর লেখাটি পাঠানো সম্ভব ছিল না। সে হিসেবে লেখাটি রাইচরণ দাসের, অনেকটা নিশ্চিত হওয়া যায় এবং তাঁর অবস্থানও ছিল কুষ্টিয়া শহরের আলমপাড়ায়। তবে মীর মশাররফের সঙ্গেও লালনের পরিচয় ছিল। কাঙাল হরিনাথের সঙ্গে লালনের পরিচয়ের সূত্র ধরেই সম্ভবত এরূপ একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। লালনের জীবদ্দশায় মীর মশাররফ হোসেন 'সঙ্গীত লহরী'তে (১২২৪) লালন সহ অন্যান্য বাউলদের বিরুদ্ধে যে ব্যঙ্গার্থক গান রচনা করেছেন তার প্রাসঙ্গিক অংশবিশেষ এরূপ :

আরে ভাই না পাই দিশে, কলির শেষে
কিসে কার মন মজেছে॥
ফিকিরচাঁদে, আজবচাঁদে,
রসিকচাঁদে সব মেতেছে
কোথা আর পাগল কানাই, লালন গোঁসাই,
সব সাঁই এতে হার মেনেছে।[৪]

তথাপি মীর মশাররফ হোসেন বাউল গান রচনায় কাঙাল হরিনাথ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে অনুপ্রাণিত হলেও তাঁর কয়েকটি গানে লালনের প্রচ্ছন্ন প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মীর মশাররফ হোসেনের জন্মস্থান লাহিনীপাড়া ছেঁউড়িয়ার অত্যন্ত নিকটে। মশাররফ হোসেন যে একাধিকবার ছেঁউড়িয়ায় এসেছিলেন তার প্রমাণ যথেষ্ট রয়েছে।[৫]

শ্রীমতি সরলা দেবী রচিত 'লালন ফকির ও গগন' শীর্ষক প্রবন্ধ 'ভারতী' পত্রিকায় ভাদ্র ১৩০২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এখানে লালনের আধ্যাত্মিক মহিমার কথা উল্লেখ রয়েছে—"এইরূপ একটি ভগবদ প্রণয়ী (লালন ফকির) চার বৎসর পূর্বে কুষ্টিয়া অঞ্চলে জীবিত ছিলেন। কুষ্টিয়ার সন্নিহিত প্রদেশে সামান্য বৈরাগীর মুখে তাঁহার ও তাঁহার কোনো শিষ্যের (গগন হরকরা) রচিত কতিপয় গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহাদের কতকগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলাম।"[৬] উল্লেখ্য যে, এ প্রবন্ধে লালনের ৭টি, গগনের ২টি এবং কাঙাল হরিনাথের ১টি গান সংকলিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের সহায়তায় লেখিকা আলোচ্য নিবন্ধটি রচনা করেন এবং এখানে লালনের পরিচিতি সংক্ষিপ্ত হলেও একটি মূল্যবান দলিল হিসেবে পরিগণিত।

লালনের জীবনী সম্পর্কে আলোকপাত করেন মৌলবী আবদুল ওয়ালী (১৮৫০-১৯২৬) যিনি খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার শারুলি গ্রামের অধিবাসী এবং পেশায় যশোর জেলার শৈলকুপার সাব-রেজিস্টার ছিলেন। তাঁর রচিত—'On some curious tenets and practices of a

৩. উদ্ধৃত, আবুল আহসান চৌধুরী, লালন সাঁইয়ের সন্ধানে, ঢাকা : পলল প্রকাশনী, ২০০৭, পৃ. ১৭০
৪. ওয়াকিল আহমদ, লালন গীতি সমগ্র, ঢাকা : বইপত্র, ২য় প্রকাশ, ২০০৫, পৃ. ১১
৫. লালন সাঁইয়ের সন্ধানে, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১
৬. উদ্ধৃত, লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

certain class of faquirs of Bengal', শীর্ষক ইংরেজি প্রবন্ধটি ১৯০০ সালে, The Journal of the Anthropological Society of Bombay' [Vol. V. No. 4, 1900, p. 217) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির জীবন সদস্য ছিলেন এবং সোসাইটির বিভিন্ন সভায় এ দেশের ধর্ম, ইতিহাস, পুরাকীর্তি বিষয়ে একাধিক গবেষণা-প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। বাংলার বাউল সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও প্রথাদি সম্পর্কিত প্রবন্ধে লালন-জীবনী সম্পর্কিত আলোচনার অংশ এরূপ :

> æAnother renowned and most melodious versifier whose Dhuas are the rage of the lower classes and sung by boatmen and others was far famed Lolon Shah. He was a disciple of Siraj Shah and both were born in the Village Harishpur, Sub-division Jhenidah, District Jessore.
>
> Having travelled long and made pilgrimages to Jagannath and other shrines and met with all sorts of devotees, he at last Settled at Mauza Siuriya, near the sub-divisional headquarters of Kustia, Nadia. Here he lived, feasted, sang and worshiped and was known as a kaestha and where he died some ten years ago. His disciples are many and his songs are numerous."[৭]

আবদুল ওয়ালী নিষ্ঠাবান গবেষক ছিলেন এবং তাঁর রচনাদি লালন-জীবনী বিষয়ক আলোচনায় যথেষ্ট ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করছে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে কুমুদনাথ মল্লিক রচিত 'নদীয়া কাহিনী' (১৩১৭) গ্রন্থে লালন সম্পর্কে যৎসামান্য আলোচনা রয়েছে :

"লালন নিরক্ষর ছিলেন। তাঁহার সুললিত পদাবলী তাঁহার হিন্দুত্বের পরিচয় দিত। বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মমতের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল এবং শ্রীকৃষ্ণকে কখন কখন অবতার স্বীকার করিতেন। সত্য ভাষা, সরল ব্যবহার তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম্মের মূল ছিল। ছেঁউড়িয়া গ্রামে তাঁহার প্রধান আখড়া ছিল। প্রতি বৎসর শীতকালে তিনি তথায় একটি উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন। ইহার শিষ্য সংখ্যা শোনা যায় প্রায় দশ সহস্র —প্রায়ই নিরক্ষর কৃষক। ইং ১৮৯১ সালের ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার প্রাতে ১১৬ বৎসর বয়সে লালনের মৃত্যু হয়।"[৮]

তবে কুমুদনাথ মল্লিক তাঁর গ্রন্থে নতুন কোনো তথ্য দিতে পারেননি। এক্ষেত্রে তিনি পূর্ববর্তী লালন-জীবনীকারদের মতই বক্তব্য রেখেছেন।

লালনের জীবন সম্পর্কে শ্রীবসন্তকুমার পালের 'ফকির লালন শাহ' প্রবন্ধ যা মাসিক 'প্রবাসী'র ১৩৩২ সনের শ্রাবণ ও ১৩৩৫ সনের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এছাড়া তাঁর 'মহাত্মা লালন ফকির' (১৩৬১) গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য।[৯]

বসন্তকুমার পালের জন্মও হয়েছিল লালনের জন্মগ্রাম ভাড়ারার পাশে ধর্মপাড়া গ্রামে। তাঁর আবাল্য লালন-জিজ্ঞাসা পরিণত বয়সে লেখনীর মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে। এবং লালন চর্চা ও গবেষণায় তার 'মহাত্মা লালন ফকির' গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।[১০]

কুষ্টিয়ার মুন্সেফ মতিলাল দাস লালনের গান শুনে মুগ্ধ হন এবং তিনি উৎসাহী হয়ে অনেক গান সংগ্রহ করেন। তাঁর 'লালন-গীতিকা' (১৯৫৮) যা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। এবং 'লালন ফকিরের গান' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ ১৩৪১ সনে বসুমতি'র শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

---

৭. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯-২০
৮. শ্রী কুমুদনাথ মল্লিক, নদীয়া কাহিনী, নদীয়া : রানাঘাট, ২য় সংস্করণ, ১৩১৯, পৃ. ৩৭৬-৩৭৭
৯. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১
১০. লালন সাঁইয়ের সন্ধানে, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯

তবে তাঁর 'লালন-গীতিকা' গ্রন্থের ভূমিকায় শশিভূষণ দাসগুপ্তের লালন জীবনীর ওপর আলোচনা থাকলেও তাঁর কোনো আলোচনা নেই, গানের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লালনের শিষ্য এবং গুরু সিরাজ সাঁই সম্বন্ধে এবং তাঁর ধর্মমত সম্বন্ধে সামান্য আলোকপাত করেছেন মাত্র।[১১]

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন দীর্ঘকালব্যাপী বাউল গান তথা লালনের গান সংগ্রহে নিয়োজিত ছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'হারামণি' যা একাধিক খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে লালনের গানের সংগ্রহ সম্বন্ধে আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। ১৯৪২ সালে 'হারামণি'র ২য় খণ্ডে লালনের জীবনী বিষয়ক আলোচনা রয়েছে। এছাড়াও সমকালের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে লালন বিষয়ক তাঁর একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তবে তাঁর সংগ্রহ পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেকের কিছুটা আপত্তি থাকলেও তিনি এক্ষেত্রে পথিকৃৎ। এ সম্বন্ধে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য :

"যা হোক, তবু এ বিষয়ে তাঁহার প্রচেষ্টা পরবর্তী অনুসরণকারীদের পথ নির্দেশ করিয়াছে, তিনিই পথিকৃৎ, সেইজন্য তিনি সর্বতোভাবে প্রশংসার্হ সন্দেহ নেই।"[১২]

বাংলার বাউল সাধক, সম্প্রদায়, ধর্মমত, তত্ত্ব, দর্শন ও সঙ্গীত নিয়ে গবেষকের দৃষ্টিতে বিচার-বিশ্লেষণের সর্বপ্রথম প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় উপেন্দ্রনাথ ভট্ট্যাচার্যের গবেষণাগ্রন্থ 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থে। তিনি নদীয়া জেলার হরিনারায়ণপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। অত্যন্ত ছোট বয়সেই মুসলমান ফকিরদের কাছ থেকে লালনের গান শুনে লালনকে জানার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি লালনের গান সংগ্রহসহ তাঁর জীবনী নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি ১৯২০ সাল থেকে লালনের গান সংগ্রহ করতে শুরু করেন। এ প্রয়োজনে ছেঁউড়িয়ার বাৎসরিক উৎসবে যোগ দেন এবং বিভিন্ন লালনপন্থী ফকির-দরবেশদের সংস্পর্শে আসেন, গানসহ বাউল দর্শনের নানাবিধ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এছাড়াও ছেঁউড়িয়ার কাছাকাছি শিলাইদহে ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত সপ্তাহব্যাপী 'নিখিল বঙ্গ পল্লীসমিতি সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত অনুষ্ঠানে বহুসংখ্যক লালনপন্থী বাউল উপস্থিত ছিলেন। এভাবে তিনি মাঠ-সমীক্ষা, সাক্ষাৎকার এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার নির্যাসে 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' অভিসন্দর্ভটি' রচনা করেন এবং লালন শাহের জীবনী রচনার ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সে ব্যাপারে তিনি উল্লেখ করেছেন :

> "লালনের জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা যায় নাই। আমি কয়েক বছর চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে যে-সমস্ত বিভিন্ন কথা শোনা যায়, তাহা প্রায়ই জনশ্রুতি। তাহাদের সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য হিসাবে নিঃসংশয়ে কিছু বলা যায় না।"[১৩]

এরূপ সংশয় থাকা সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিগত জ্ঞান-অভিজ্ঞতা এবং তথ্য-উপাত্তের নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে লালনের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হয়েছে তার গুরুত্ব যথেষ্ট। এ ছাড়াও বিভাগোত্তরকালে বেশ কয়েকজন লালন-জীবনী নিয়ে গবেষণা করে তাঁদের মতামত প্রদান করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম, অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরী, অধ্যাপক এস.এম. লুৎফর রহমান ও ড. খোন্দকার রিয়াজুল হক। জন্মসূত্রে আনোয়ারুল করিম এবং আবুল আহসান চৌধুরী কুষ্টিয়ার এবং এস.এম. লুৎফর রহমান মাগুরার এবং রিয়াজুল হক ঝিনাইদহের বাসিন্দা। উল্লেখ্য যে, লালন-চর্চা এ সময় থেকে ঢাকা কেন্দ্রিক হয়ে উঠে।

এস.এম. লুৎফর রহমান ১৯৭৭ সালে 'বাউল সাধনা ও লালন শাহ' শিরোনামে পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ সম্পন্ন করেন। তবে অভিসন্দর্ভটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না হলেও তিনি ইতোমধ্যে 'লালন শাহ : জীবন ও গান' (১৯৮৩), 'লালন-জিজ্ঞাসা' (১৯৮৪) এবং 'লালন-গীতি চয়ন' (১৯৮৫) নামে তিনটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি লালন-জীবনী রচনায় একটি ভিন্নমাত্রা যোগ করেন। লালন-শিষ্য দুদ্দু শাহ রচিত 'লালন-জীবনী' অবলম্বনে লালনের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনায় প্রয়াসী হন। পয়ার ছন্দে রচিত ১৪৮ চরণের সংক্ষিপ্ত লালনের 'আত্মকথা'কে তিনি অকৃত্রিম হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

---

১১. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

১২. অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বংলার বাউল ও বাউল গান, ২য় খণ্ড, কলিকাতা : দীপান্বিতা, ১৩৬৪, পৃ. ৪

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

এ জীবনীর অংশ বিশেষ এরূপ—

ধন্য ধন্য মহামানুষ দয়াল লালন সাই
পতিত জনার বন্ধু তাঁর গুণ গাই।
জাতি ধর্ম শাস্ত্র আদি মীমাংসা করিয়া,
নব সত্য প্রকাশিল মানব লাগিয়া॥

আমার দয়াল মুরশীদ কৃপা প্রকাশিয়া
তাঁর আত্ম-কথা কিছু গিয়াছে বলিয়া।
তাঁর মহা আত্ম-কথা আমি কি জানিব
যার কথা সে যদি না কয় কিসে প্রকাশিব॥

এবং এর শেষাংশ এরূপ—

মানুষ অবতার সাই তাহার মহিমা।
কি বলিব আমি হীন নাই তার সীমা।
ওলিয়ে আরেফ্ সাই বাঙ্গালা দেশেতে॥
দীনহীন দুদ্দু ভণে তাঁহার কৃপাতে॥
দয়াল মুরশীদ সাই আল্লাহু আলেখ্।
যারে ধরে মিলিয়াছে বরজখ্ ছালেক॥

সন ১৩০৬ সাল ১লা কার্তিক বার্ষিক অধিবাস ছেঁউড়িয়া থানা ভালুকা জেলা নদীয়া।[১৪]

তবে এ পাণ্ডুলিপিতে লালনের জন্মকাল, জাতি-পরিচয়, বংশ পরিচয়, শৈশব-কৈশোর, পদ্মাবতীর আশ্রম, দেশ ভ্রমণ এবং ছেঁউড়িয়া আগমন ইত্যাদি বিষয়ে ধারাক্রমে বর্ণনা থাকলেও লালনের গান সম্পর্কিত কোনো আলোচনা এখানে নেই। তিনি কি উদ্দেশ্যে গান রচনা করেন এবং কখন ও কি অবস্থার সেগুলো পরিবেশিত হতো তাও জানার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।[১৫] এক্ষেত্রে এ পাণ্ডুলিপির আবিষ্কারক লুৎফর রহমান নিজেও সংশয় প্রকাশ করেছেন এভাবে—"উক্ত জীবনীতে বিবৃত সকল ঘটনাই অসংশয়ে গ্রহণ করা যায় না।"[১৬]

ড. আনোয়ারুল করিম ও ড. রিয়াজুল হক লালনকে মুসলিম পরিবারের সন্তান এবং তাঁর জন্মস্থান হরিশপুর বলে যে মন্তব্য করেছেন তা প্রায় এস.এম. লুৎফর রহমানের বক্তব্যের মতই। অন্যদিকে ড. আবুল আহসান চৌধুরী লালনকে হিন্দু ঘরের সন্তান এবং তাঁর জন্ম ভাড়ারা গ্রামে বলে যে মন্তব্য রেখেছেন তা মূলত রাইচরণ দাস, বসন্তকুমার পাল ও উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের অনুরূপ।

লালন-জীবনী চর্চার ক্ষেত্রে এরূপ এক সমান্তরাল ধারাকে নিয়ে অদ্যাবধি আলোচনা-সমালোচনা চলছে। এক্ষেত্রে ড. ওয়াকিল আহমদ তাঁর 'লালন গীতি সমগ্র' গ্রন্থের প্রারম্ভে লালন-জীবনীর ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী গবেষকদের তথ্য-উপাত্তকে নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে আরোহণ পদ্ধতিতে যে জীবন-কাঠামো নির্মাণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন তা লালন-জীবনী রচনার ক্ষেত্রে আমাদের কাছে অনেকটা সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

জন্মকাল

বর্তমানে নানাবিধ গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে লালন শাহের জন্মকাল ১৭৭২ সাল মতান্তরে ১৭৭৪ সাল হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।[১৭] লালন ফকিরের গানের প্রসঙ্গত আলোচনা মতিলাল দাস তাঁর জন্ম-

১৪. এস.এম. লুৎফর রহমান, লালন শাহ : জীবন ও গান, ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ৩য় সংস্করণ, ২০০৬, পৃ. ১৮৩-১৮৭

১৫. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

১৬. লালন শাহ : জীবন ও গান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

১৭. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৭ম সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

বর্ষ ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়া থেকে প্রকাশিত 'হিতকরী' পত্রিকায় তথ্য পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাঁর তথ্যের সুনির্দিষ্ট কোনো সূত্র পাওয়া যায়নি বলে লালন শাহের জন্মবর্ষ ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দ মতটি গ্রহণ করা যায় না।[১৮]

খ্যাতনামা বাউল গবেষক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন তাঁর (লালনের) জন্ম হয় বাংলা ১১৮১ সালে, ইংরেজিতে ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে।[১৯] বিশিষ্ট লালন গবেষক মনসুর উদ্দীন লালনের জন্মকাল ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন।[২০] তবে এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো সূত্রের তিনি অবতারণা করতে পারেননি। অবশ্য কোনো কোনো গবেষক লালন শাহের জন্মকাল ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি বলে উল্লেখ করেছেন।[২১] লালনের জন্মকাল নিয়ে লুৎফর রহমান তাঁর আবিষ্কৃত দুদ্দু শাহের পাণ্ডুলিপি থেকে উল্লেখ করেছেন—লালনের জন্মকাল ১১৭৯ সালের ১লা কার্তিক অর্থাৎ লালনের আয়ুষ্কাল আর দুই বছর বেড়ে ১১৮ বছরে উন্নীত হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এ পাণ্ডুলিপিটির অকৃত্রিমতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। গবেষক ও লালন-জীবনী রচয়িতা অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম উল্লেখ করেছেন, "১৭৬৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দের যে কোনো এক সালকে আমরা লালন শাহের জন্মের কাল ধরে নিতে পারি...মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ১২৬ বৎসর হয়েছিল অনেকে ১২৬ বৎসরকে বহুদিনের পুরোনো ও অস্পষ্টতার জন্য ১১৬ বৎসর বলে পড়েছেন।"[২২] কিন্তু এ বিষয়ে যুক্তিনিষ্ঠ কোনো প্রমাণ তিনি দেখাতে পারেননি। লালন-গবেষক সনৎকুমার মিত্র তার 'লালন ফকির : কবি ও কাব্য' নামক গ্রিফিথ পুরুস্কার প্রাপ্ত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, যেহেতু কোনো পাথুরে প্রমাণ দ্বারা তাঁর জন্ম তারিখ নির্ণয় করা আদৌও সম্ভব নয়, সেহেতু তিনি এভাবে এ বিষয়ের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন—

"তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ বা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে জন্মগ্রহণ করেন।"[২৩] কিন্তু মোটামুটি কাছাকাছি একটি তারিখকে নিয়েই তো গবেষণা-কর্ম প্রবহমান থাকতে হবে। তিনি তা আবিষ্কার করতে পারেননি। তবে ১৭৭২ কিংবা ১৯৭৪ সালই লালনের জন্মতারিখ হিসেবে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়েছে আসছে।

জন্মস্থান ও জাতি পরিচয়

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বসন্তকুমার পালের 'মহাত্মা লালন ফকির' শীর্ষক প্রবন্ধটির একটি বিশেষত রয়েছে যে লালন শাহের মৃত্যুর পরেই তাঁর জীবনী ও গান নিয়ে এটি সর্বপ্রথম রচনা। এখানে প্রবন্ধকার উল্লেখ করেছেন যে, লালন শাহের জন্মস্থান কুষ্টিয়ার কুমারখালী থানার গোরাই নদীর তীরবর্তী ভাড়ারা গ্রাম। অবশ্য এ বক্তব্যের পূর্ণ সমর্থন করেছেন উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, মুহম্মদ আবদুল হাই, ড. শশিভূষণ দাসগুপ্ত, ড. আনিসুজ্জামান প্রমুখ পণ্ডিত, তথাপি লালনের জন্মস্থান নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম বলেছেন এই গ্রামেরই ১২০ বয়স্ক জনাব আহাদালী মণ্ডল, প্রায় সত্তর বৎসর বয়স্ক জনাব মুন্সী আবদুল আজিজ সাহেব প্রমুখ প্রবীণ ব্যক্তিদের মতে লালনের জন্মস্থান যশোরের কুলবেড়ে হরিশপুর গ্রামে।"[২৪] এ মতের সাদৃশ্য রয়েছে মৌলবী আবদুল ওয়ালীর বক্তব্যে—'Both (Siraj & Lalon) were born of the

১৮. লালন শাহ : জীবন ও গান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২-২৪
১৯. বাংলার বাউল ও বাউল গান পূর্বোক্ত, পৃ. ৮
২০. মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, হারামণি, ৪র্থ খণ্ড, ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯, পৃ. ৬৪
২১. ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, কলিকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৯৯০, পৃ. ৬৫৩
২২. আনোয়ারুল করিম, বাউল কবি লালন শাহ, ঢাকা : বাংলাবাজার, ১৯৯৬, পৃ. ১২-১৩।
২৩. শ্রী সনৎকুমার মিত্র, লালন ফকির : কবি ও কাব্য, কলিকাতা : পুস্তক বিপণি, ঝুলনযাত্রা, ১৩৮৬, পৃ. ৬২
২৪. বাউল কবি লালন শাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

village Harishpur.'[২৫] খোন্দকার রফিউদ্দীন, অধ্যাপক করিমের ন্যায় বক্তব্য রেখেছেন, "ফকির লালন শাহের জন্মভূমি যে যশোর জেলার হরিনাকুণ্ডু থানার অধিন হরিশপুর গ্রামেই ছিল, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।..."[২৬]

এরূপ মন্তব্য এস.এম লুৎফর রহমান, খোন্দকার রিয়াজুল হক, অধ্যাপক আবূ তালিবের। কিন্তু এ বিষয়েও যথেষ্ট মত পার্থক্য লক্ষ্য করার মতো। যাঁরা জাতিগতভাবে লালনকে মুসলমান ভাবতে আগ্রহ প্রকাশ করেন তাঁদের কাছে লালনের জন্মভূমি হরিশপুর বেশি প্রাধান্য পায়। সুতরাং এ বিষয়ে নিরপেক্ষ গবেষণা হওয়া উচিত। লালন তাঁর গানে হিন্দু-মুসলমান ঐতিহ্য সমানভাবে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করেছেন। যা পরবর্তীতে একমাত্র কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছাড়া অন্য কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। সুতরাং হিন্দু ধর্মের কথা বলতে গিয়ে লালন হিন্দু ঘরের সন্তান হবেন আর মুসলমানের কথা বলতে গিয়ে মুসলমান হবেন এ ধারণার ভিত্তি নেই। তবে তাঁর গানের ভণিতায় 'ভেড়ে', 'ভেড়ো' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'ভাড়ারা' গ্রামের অধিবাসী হিসেবে 'ভেড়ো' শব্দটি হলেও এর মূলগত অর্থ স্ত্রৈণ।'[২৭] কিন্তু এরূপ হওয়ার কথা লালনের মত মহান ব্যক্তির পক্ষে অবাঞ্ছণীয়। সুতরাং ভণিতায় এরূপ শব্দ চয়নেও লালন 'ভাড়ারা' গ্রামেরই অধিবাসী এ দিকেই সমর্থন বেশি পাওয়া যায়।

লালন শাহ তাঁর জাত কিংবা জাতি পরিচয়ে বরাবরই যেমন নীরব ছিলেন তেমনি জাতের প্রশ্নে অভিমানও ছিল যথেষ্ট। তাঁর অসংখ্য গানে জাতের ব্যাপারে তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ হয়েছে তা এরূপ—

> ১. 'জাত গেল জাত গেল বলে/একি আজব কারখানা।' ২. 'সবায় শুধায় লালন ফকির কোন জাতির ছেলে/কারে বা কী বলব আমি দিশা না মেলে।' ৩. 'সবাই শুধায় লালন ফকির হিন্দু কি যবন/কারে কি বলব আমি না জানি সন্ধান।' আবার তিনি এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে নতুন এক প্রশ্নের অবতারণা করেছেন—'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে/লালন বলে জাতির কিরূপ দেখলাম না এক নজরে।' এ ছাড়াও জাতের ব্যাপারে তাঁর যে গভীর অভিব্যক্তি তা এরূপ—'যখন তুমি ভবে এলে/কি জাত তুমি হয়ে এলে।/যাবার বেলায় কোন জাত হলে/সে কথা খুলে বল না।'

তাই তো তিনি জাত-পাতের দ্বান্দিকতা পরিহার করে মানুষকেই গ্রহণ করেছেন একমাত্র পূজনীয় হিসেবে। দর্শন-তত্ত্বও এভাবে আবর্তিত হয়েছে গানে গানে সুরে সুরে সমস্ত ভেদ-ভেদাভেদ বিসর্জন দিয়ে তাঁর অমোঘ উচ্চারণে—

মানুষতত্ত্ব যার সত্য হয় মনে।
সেকি অন্য তত্ত্ব মানে ॥

অন্যদিকে গুরু সিরাজ সাঁইয়ের নিকট দীক্ষা; জীবনের জটিল চক্রে হয়ত মুসলমান গৃহে অন্ন গ্রহণ এরূপ বিষয়গুলোও উড়িয়ে দেয়ার মত নয়। তারপরেও তাঁর জীবনের পারিবারিক কাঠামো থেকে অনুমান করা যায় তিনি হিন্দু ঘরের সন্তান যদিও দলিল-দস্তাবেজে মুসলমান নামকরণ হয়েছে তা ধর্মান্তরিত পরিবর্তিত জীবনের বহিঃপ্রকাশ হতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা এটুকু মাত্র উপলব্ধি করতে পারি।

বাল্যজীবন

লালনের বাল্যকাল নিয়েও মতবিরোধ রয়েছে, একদল গবেষক মতে লালনের বাল্যনাম লালন কর, নালনচন্দ্র রায়, লালন দাস। তিনি অতি বাল্যবয়সে পিতৃহীন হন। এবং তাঁর মা জীবিত থাকাবস্থায় তারই স্নেহে লালিত-পালিত হয়ে বেড়ে উঠেন এবং তখনকার প্রচলিত নিয়মানুসারে তিনি বিয়ে করে সংসার জীবন বাঁধেন। কোনো প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেননি। অপর দলের মতে লালন

২৫. লালন শাহ : জীবন ও গান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫
২৬. খোন্দকার রফিউদ্দীন, ভাব-সঙ্গীত, ঢাকা : ২য় সংস্করণ, ১৩৭৪, পৃ. [1]
২৭. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯

অতি শৈশবেই পিতৃ-মাতৃ হারা হন; এবং তাঁর গ্রামের পার্শ্বেই এক গৃহস্থের গরু চরানোর কাজে নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে পার্শ্ববর্তী গ্রামের সিরাজ সাঁই, যিনি পেশায় পাল্কীবাহক ছিলেন তাঁরই স্নেহেই তিনি লালিত-পালিত হন; এবং সিরাজ সাঁইয়ের গৃহেই তিনি প্রায় তাঁর জীবদ্দশাতেই ২৬ বছর অতিবাহিত করেন। এ সময় তিনি মক্তবে সামান্য আরবি, ফারসি শিক্ষা লাভ করে থাকতে পারেন। এছাড়া অন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেননি। তাঁর গানগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে তাঁর বাল্য ও শিক্ষাজীবন সম্বন্ধে খুব তেমন কিছু জানা না গেলেও তিনি যে কিছুটা পড়াশুনা করেছিলেন তা বোঝা যায়।[২৮] কিন্তু এ ব্যাপারেও কোনো বস্তুনিষ্ঠ তথ্য নেই। তাঁর জীবনের এ অংশটি একেবারেই অন্ধকারাচ্ছন্ন; কাজেই এ ব্যাপারে খুব বেশি বলার সুযোগ নেই।

তীর্থ ভ্রমণ

লালন শাহের জীবনী আলোচনায় তীর্থভ্রমণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আমরা তাঁর জীবনী আলোচনায় দেখতে পাই, তীর্থ ভ্রমণের দু'টি পর্ব— ১. জীবনের প্রথম পর্যায়ে, ২. দর্শন তত্ত্বে ও ফকিরি মতে দীক্ষা প্রাপ্ত হওয়ার পরে।

প্রথম জীবনে তীর্থ ভ্রমণ সম্বন্ধে অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন—"প্রথম যৌবনে তিনি হিন্দুদের অন্যতম তীর্থক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্রে যান। তখন পুরীধামে পায়ে হাঁটিয়া যাইতে হইত।"[২৯] এর পরের আলোচনা এ তীর্থযাত্রায় তিনি বসন্তরোগে আক্রান্ত হন এবং সঙ্গীরা তাঁকে ফেলে চলে আসে। আবার অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন :

'লালন ১০/১২ বৎসর বয়সে বারুণী গঙ্গাস্নান উপলক্ষে মুর্শিদাবাদে যান, তথায় উৎকট বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া মুমূর্ষু দশায় পিতামাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হন।'[৩০]

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের বক্তব্য—

...'তিনি গ্রামের লোকের সহিত নবদ্বীপে গঙ্গাস্নান করিতে যান। এই স্থানে তিনি দূরারোগ্য ব্যাধি বসন্ত দ্বারা ভীষণভাবে আক্রান্ত হন। তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া আত্মীয়বর্গের অনুরোধক্রমে তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহাকে অন্তর্জলী করেন এবং মৃত বোধে তাঁহাকে গঙ্গাকুলে ফেলিয়া আসেন। একজন দরিদ্রা মুসলমান রমণী নদীতে পানি সংগ্রহ করিতে আসিয়া দেখেন লালন মারা যান নাই এবং তাঁহার নিকট পানীয় প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি তাঁহার মুখে পানি দেন পরে তাঁহাকে তাঁহার বাড়িতে লইয়া যান।'...[৩১] এবং এর পরে সে রমণীর সেবায় তিনি আরোগ্য লাভ করেন। কিন্তু লালন গৃহে অবস্থান করিতে অসম্মত হন এবং তিনি দেশ ভ্রমণে বাহির হন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকেই আমরা তাঁর প্রথম জীবনের তীর্থভ্রমণ অর্থাৎ তিনি মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, শ্রীক্ষেত্র, খেতুরী প্রভৃতি জায়গায় যেখানেই যান এবং এ ক্ষেত্রে তিনি অবশ্যই নিয়মানুসারে আত্মীয়-স্বজন, সঙ্গী-সাথী কিংবা পাড়া প্রতিবেশীদের সাথে গিয়েছিলেন। যাওয়ার সময় কিংবা ফেরার পথে যে সময়ই হোক তিনি যে বসন্তরোগে আক্রান্ত হন এবং তখনকার সময়ে এ রোগ বড় মহামারী আকারে হচ্ছিল এবং একে ব্যাপকভাবে ছোঁয়াচে এরূপ বিশ্বাসে তাঁর সঙ্গী-সাথীরা তাঁকে পরিত্যাগ করতে পারে, তা স্বাভাবিক ছিল। লালন যে বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং যেভাবেই হোক পরিত্যক্ত অবস্থায় এক মুসলমান রমণীর গৃহে আশ্রয় পান এবং তাঁদের সেবায় তিনি আরোগ্য লাভ করেন তা সত্য। তাঁর চোখে ও মুখে বসন্তের গভীর চিহ্ন এর সাক্ষ্য বহন করে। যাই হোক আরোগ্য লাভের পর তিনি নিজগৃহে ফিরে যান। কিন্তু মুসলমান গৃহে অন্নজল গ্রহণ করায় এবং তাঁর নিজ গৃহে পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ায় সমাজ-সংসার কর্তৃক তিনি বিতাড়িত হলেন এবং স্ত্রী ও জননীর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সামাজিক, শাস্ত্রীয় বিধানের প্রতি অপরিসীম আনুগত্যের ফলে তাঁরাও তাঁকে

২৮. মনোয়ার হোসেন খান, বাউল সম্রাট লালন শাহ, ঢাকা : বেতার বাংলা, পঞ্চম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, ১৯৭৬, পৃ. ২

২৯. বাংলার বাউল ও বাউল গান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

৩০. উদ্ধৃত, লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০

৩১. হারামণি, ৪র্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

চিরতরে পরিত্যাগ করেন। ফলে, লালনের জাতি-ধর্ম, গোত্র, সমাজ-সংসার সম্বন্ধে এক বিরাট বৈরাগ্যভাবের উদয় তখন থেকেই। এবং তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর আশ্রয়দাতার কাছেই ফিরে যান।

এবার আমরা তাঁর পরিণত জীবনের তীর্থভ্রমণের বিষয়ে আলোচনা করবো।

...'১৭৭৮ সালে সিরাজ শাহ ইহলোক ত্যাগ করেন। অল্পদিন পরেই সিরাজ পত্নীও ইহজগৎ থেকে বিদায় নেন। গুরু ও গুরুমাকে হারিয়ে লালন একান্ত অসহায় হয়ে পড়েন। উদাসীন মন আর ঘরে থাকতে চায়না। গুরুদত্ত খেরকা ও আচলাজোলা সার করে তিনি অজানার পথে পা বাড়ান...।'[৩২] তিনি শুধু হিন্দু তীর্থস্থান নয় বরং দিল্লি. লক্ষ্ণৌ, মধ্য এশিয়া এমনকি মক্কা শরীফ গমন করেছিলেন।[৩৩] এছাড়া তীর্থভ্রমণের যে নেশা এবং নিজেকে ঋদ্ধ করার যে তীব্র বাসনা তাঁকে প্রতিনিয়ত তাড়িত করেছিল তারও প্রমাণ তাঁর রচিত গানেই রয়েছে—

লালন ফকীর আসলে মিথ্যে
ঘুরে বেড়ায় তীর্থে তীর্থে
না চিনে আপন ভুবন।[৩৪]

যাইহোক তীর্থভ্রমণের ঘটনাই তাঁর জীবনের বাঁক পরিবর্তনে যে সুদূর ভূমিকা রেখেছে, তাতে তিনি আজকের লালনে পরিণত হয়েছেন।

লালন-স্ত্রী

লালনের স্ত্রী সম্বন্ধে মতবিরোধ বিদ্যমান। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন যে, লালন অতি অল্প বয়সেই বিবাহ করেছেন।[৩৫] এ ব্যাপারে এস.এম. লুৎফর রহমানের বক্তব্য হচ্ছে যে, 'লালন শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হন এবং সিরাজ সাঁইয়ের আশ্রয়ে থাকেন, সিরাজ সাঁইয়ের ইচ্ছা অনুসারে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তাঁর জীবনে তেমন কোনো ঘটনা ঘটেনি বিধায় লালন প্রায় ২৬ বছর পর্যন্ত অকৃতদার ছিলেন। তবে তাঁর স্ত্রীর ব্যাপারে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তার নিষ্পত্তি তিনি এভাবে গ্রহণ করেছেন যে, সাধন-সঙ্গিনীর প্রয়োজন বাউলমতে রয়েছে। কিন্তু তৎকালীন ইন্ডিয়ান পেনাল কোড-এর প্রতি শংকা পোষণ করে তিনি কিছু মামুলি অনুষ্ঠানাদি করে তাঁকে স্ত্রীরূপে দেখানো হয়েছে মাত্র।[৩৬] কিন্তু অধ্যাপক রহমানের এ বক্তব্য সঠিক নয়। প্রথমত, বলা যায় একেবারে শৈশবে পিতৃহারা হন এবং মায়ের আদর্শে তাঁর শৈশব-কৈশোর অতিবাহিত এবং অত্যন্ত বাল্য বয়সেই বিবাহ সম্পন্ন হয়—এ বিষয়ে অনেক যুক্তি রয়েছে। অপরদিকে ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ভয়ে তিনি সাধন-সঙ্গিনীকে স্ত্রীরূপে দেখাবেন, এমন ভয়-ভীতি-দর্শন লালন পালন করবেন না নিশ্চয়।

আবার অন্য একটি সূত্র থেকে উল্লেখ রয়েছে, "সিরাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা লালনের বাল্য থেকে। আর এই যবনসঙ্গ মা ও স্ত্রী মেনে নিতে পারেননি। জাতিবুদ্ধি এবং সংস্কার বিসর্জন না দিয়ে তারা বরং লালনকে বিসর্জন দেন নিরুপায় হয়ে।"[৩৭] লালনের স্ত্রীর ব্যাপারে যে জনশ্রুতি রয়েছে তা এমন, "শোনা যায় লালন ফকির বিয়ে করেছিলেন, তবে তার কোন সন্তানাদি হয় নাই।"[৩৮] লালন ঘরানার ভক্ত ফকির আনোয়ার হোসেন মন্টু শাহ উল্লেখ করেছেন যে, বিশখা ফকিরণী লালনের সহধর্মিণী

৩২. খোন্দকার রিয়াজুল হক. মরমি কবি লালন শাহ : জীবন ও সঙ্গীত, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯, পৃ. ৩৯
৩৩. লালন শাহ : জীবন ও গান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫
৩৪. ঐ, পৃ. ১২৭
৩৫. বাংলার বাউল ও বাউল গান, পূর্বোক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৮
৩৬. লালন শাহ : জীবন ও গান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩-৮৪
৩৭. শক্তিনাথ ঝা, ফকির লালন সাঁই : দেশ কাল এবং শিল্প, কলিকাতা : সংবাদ, ১৯৯৫, পৃ. ২৩৭
৩৮. মহসিন হোসাইন, বৃহত্তর যশোরের লোককবি ও চারণ কবি, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, পৃ. ১

ছিলেন।[৩৯] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশখার সঙ্গে তাঁর কোনো বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল এরূপ প্রমাণ পাওয়া দুষ্কর। যদিও উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও মনসুর উদ্দীন দুজনেই উল্লেখ করেছেন, লালন বিবাহিত ছিলেন। তিনি মুসলমান জোলা পরিবারের মেয়েকে নিকা করেন, তাঁর স্ত্রী পর্দানশীল ছিলেন। কিন্তু এরূপ বক্তব্যের কোনো যুক্তিনিষ্ঠ প্রমাণ আমরা পাইনি। বিশখা ও লালমতি দুজনে যে লালনের সাধন-সঙ্গিনী ছিলেন এবং বিশখা গুরুকে এতটাই শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর গুরুর পদপাদে তাঁর সমাধি স্থাপিত হয়। স্ত্রীর ব্যাপারে তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হিতকরী পত্রিকাও কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য দিতে পারেনি। বরং লালনের সাধন জীবনে আখড়ার সাধন-সঙ্গিনীকেই স্ত্রীরূপে দেখানো হয়েছে এভাবে, "আখড়ায় ইনি সস্ত্রীক বাস করিতেন, সম্প্রদায়ের ধর্ম-মতানুসারে ইহার কোনো সন্তান-সন্ততি হয় নাই। শিষ্যগণের মধ্যেও অনেকের স্ত্রী আছে, কিন্তু সন্তান হয় নাই।" এ বক্তব্য থেকেও উপলব্ধি করা যায়, প্রচলিত ধারণার মত স্ত্রীর কাজ ঘর-সংসার এবং সন্তান জন্মদান, লালন ও তাঁর শিষ্যরা এভাবে গ্রহণ করেননি, বরং সাধন-ভজনে এরা সাধন-সঙ্গিনী। তাহলে লালনের স্ত্রী ঐ একজনই—যার সম্বন্ধে বসন্তকুমার পালের যথার্থ বক্তব্য—"সমাজের মুখে চাহিয়া স্ত্রী অকালে কালগ্রস্তা।"[৪০] আর এ কালগ্রস্তার সঠিক কোনো তথ্য-প্রমাণ আজও উদ্‌ঘাটিত হয়নি।

লালন-জননী

লালনের ব্যক্তিজীবনে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় তাঁর জন্মদাত্রীকে নিয়ে জটিলতাও বিদ্যমান। কোন কোন গবেষকের মতে লালনের মাতার নাম পদ্মাবতী আবার অন্য একদল গবেষকের মতে লালনের মাতার নাম আমেনা। অবশ্য শেষোক্ত দলের গবেষকদের লালনের জননীর নাম আবিষ্কারের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করার যে প্রয়াস তা একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়। তবে জননীর নাম কি এর বিস্তারিত পরিচয় না পেলেও তাঁর গানে অনেক সময় ভাব-তত্ত্ব ছেড়ে যে ব্যক্তিগত জীবনের কোন স্মৃতি উঁকি দেয়নি এরূপ ভাবাও যায় না। অপ্রত্যাশিতভাবেই হোক কিংবা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হোক কৃষ্ণের বাল্যলীলা প্রেক্ষাপটে রচিত একটি গানে জননীর চিত্রটি এরূপ—

> 'ননীর জন্য আজ আমারে
> মারিস নে মা বেঁধে ঘরে
> দয়া নাই মা তোর অন্তরে
> স্বল্পেতে তা গেল জানা।[৪১]

এখানে আমরা অনুমান করতে পারি, লালনের প্রথম জীবনে সিরাজ সাঁইয়ের গৃহে অন্নগ্রহণ এবং যবনসঙ্গ গ্রহণ—এ অপরাধ তাঁর জননীর কাছে ও তৎকালীন সমাজের, শাস্ত্রের দৃষ্টিতে অমার্জনীয়। তাই লালন-জননী আপন সন্তানকে বিসর্জন দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন আজন্ম লালিত ধর্মীয় বিশ্বাস। তাই জননীর ক্রোড়চ্যুত সন্তান লালন বাধ্য হয়েই যেন জননী প্রদত্ত রায়কে মেনেছিলেন এভাবেই 'দয়া নাই মা তোর অন্তরে'। বাংলা সাহিত্যে যশোদা ও শচীমাতা বিগলিত করুণার এক পুণ্যস্রোত। কিন্তু লালনের শচী বাস্তবিক রমণী, যশোদা 'নিদয়া জননী'।[৪২] এরূপ অনেক গানে লালনের দুঃখজনক স্মৃতির বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়েছে তত্ত্ব-দর্শনের পাশাপাশি। তিনি জানতেন 'প্রেমে মজিলে ধর্মাধর্ম ছাড়িতে হয়'; প্রেমের তীব্রতায় 'রাজা যেমন রাজ্য ছাড়ে', আবার মনের মানুষকে পাবার ব্যাকুলতায় এমনই হয়—'কুলে কালি দিয়ে ভোজিব সই'। অন্যদিকে মনের মানুষ পাওয়াই যেন গুরু প্রদত্ত কড়া নির্দেশ—'কর লালন এমনী সঙ্গ কহে সিরাজ সাই নিরবধি' আর এরূপ সান্নিধ্যে

---

৩৯. ফকির আনোয়ার হোসেন মন্টু শাহ, লালন-সঙ্গীত, ১ম খণ্ড, কুষ্টিয়া : ছেঁউড়িয়া, ৫ম সংস্করণ ২০১১, পৃ. ৬১

৪০. শ্রী বসন্তকুমার পাল, ফকির লালন শাহ, আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত লালন স্মারকগ্রন্থ, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ, মার্চ, ১৯৭৪, পৃ. ১৯

৪১. ডক্টর এম. এস. লুৎফর রহমান, লালন গীতি চয়ন, ঢাকা : ডিসেম্বর ১৯৮৫, ধারণী সাহিত্য সংঘ, পৃ. ১৪৫

৪২. ফকির লালন সাঁই : দেশ কাল এবং শিল্প, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

যেন সবকিছুকে ছাড়িয়ে যায়—'জখম রূপ স্মরন হএ থাকে না লোক লজ্জা ভয়, অধীন লালন বলে প্রেম যে করে সেই জানে'।[৪৩] তাই শুদ্ধ প্রেমিকের জীবনে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, জনক-জননী এমনকি সমাজ-সংসার-ধর্ম, বিদ্যা-বুদ্ধি, লোক-লজ্জা কিছুই তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনা। অপার প্রেমের স্পর্শে দিশেহারা, বিস্মৃত জগৎসংসারের জোয়ারে ফুঁসে ওঠা—এমনি সাধকের জীবনে লালন তাঁর জননী এবং প্রাণপ্রিয় রমণী সবকিছুকেই বিসর্জন দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন মানবপ্রেমের অমিয় সুধাবাণী—

> ভবে মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার।
> সর্ব সাধন সিদ্ধি হয় তার ॥[৪৪]

কিন্তু এরূপ ভাবরাজ্যে এই মানুষটিরও জননীর প্রতি ভালবাসার তিল পরিমাণ কমতি ঘটেনি, বরং নিরাশ্রয়-নিঃসঙ্গ 'ভেকাশ্রিতা' জননীর মহাপ্রয়াণে হৃদয়ের গভীরে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল তা অনেকের জানবার নয়, তদুপরি ছেঁউড়িয়া আখড়া থেকে আহার্য-সামগ্রী পাঠিয়ে জননী মহোৎসবাদি যথাবিধি সম্পন্ন করে মাতৃভক্তির এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন।[৪৫]

এছাড়াও তাঁর গানে উপমা-রূপক ও হেঁয়ালির অন্তরালে সমাজ-সংসারে অবজ্ঞা-উপেক্ষিত নারীর বেদনা-দুর্বলতা-অসহায়ত্ব-অভিমান-বিরহের পাশাপাশি মহিমান্বিত শ্রেষ্ঠত্ব উপস্থাপিত হয়েছে; প্রতিকূল পরিস্থিতির আঘাতে লালনের সাধক জীবনে আপন জননী যেন হয়ে উঠেছে গৌরবের এক ভিন্ন প্রেরণার নিবিড় উৎসমূল।[৪৬]

লালন-গুরু সিরাজ সাঁই

সিরাজ সাঁই সম্বন্ধেও মতবিরোধ আছে। কোন কোন লালন-গবেষক মনে করেন, সিরাজ সাঁই কোন ব্যক্তি নন বরং প্রয়োজনে একটি প্রতীকধর্মী নাম। অবশ্য এ বিষয়ে কাঙাল হরিনাথ তাঁর কাঙালের ব্রহ্মাণ্ডবেদ (১৮৮৫-৮৬) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'সিরাজ সাঁই ছিলেন সিদ্ধযোগী'। এছাড়া আরও পরিষ্কারভাবে তথ্য পাওয়া যায় লালন শাহ খরিদকৃত ভূসম্পত্তির রেজিস্ট্রি দলিলে পিতার নাম সিরাজ সাঁইয়ের উল্লেখ থেকে।[৪৭]

এখন পর্যন্ত এ লালন-গুরু সিরাজ সাঁইয়ের জন্মস্থান কিংবা নিবাস নিয়েও বিতর্ক শেষ হয়নি। অধ্যাপক আবূ তালিব, খোন্দকার রিয়াজুল হক এবং এস. এম. লুৎফর রহমানের মতে সিরাজ সাঁইয়ের জন্ম যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার হরিশপুর গ্রামে। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী গবেষকদের মধ্যে বসন্তকুমার পাল জন্মভূমি উল্লেখ করেছেন যশোর জেলার ফুলবাড়ি গ্রাম; মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন প্রথমে কুষ্টিয়ার হরিনারায়ণপুর ও পরে কুমারখালী বলে মত দিয়েছেন। অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ভোলানাথ মজুমদারের তথ্য থেকে উল্লেখ করেছেন সিরাজ সাঁইয়ের জন্মস্থান ফরিদপুর জেলার কালুখানি স্টেশনের সন্নিকটে কোন এক গ্রামে।[৪৮] অবশ্য সিরাজ সাঁইয়ের পেশাগত পরিচয়ে যে তিনি পাল্কীবাহক ছিলেন এ বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই। কেউ কেউ সিরাজ সাঁইয়ের সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন— বড় তত্ত্বজ্ঞ সাধক কিংবা পীর-মুর্শিদ ছিলেন না, তিনি তত্ত্বকথা শোনা, ধর্মীয়সভায় গমন এবং আধ্যাত্মিক গানের আসরে গমন করতেন। এবং আমানত উল্লাহ শাহ ওরফে আমানদি শাহ নামে এক গুরুর কাছে তিনি ফকিরি মতের দীক্ষা লাভ করেন।[৪৯] তাঁর নিবাস ছিল চট্টগ্রামে এবং তাঁর দরগাহ চট্টগ্রামের বক্শী বাজারে অবস্থিত।

---

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৯-২৪০।

৪৪. লালন গীতি চয়ন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭

৪৫. লালন স্মারকগ্রন্থ,পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

৪৬. আবদুল ওয়াহাব সম্পাদিত,মহাত্মা লালন : মানবতাবাদ ও সংগীত, ঢাকা: সাম্প্রতিক প্রকাশনী, ২০১১, পৃ. ৪৯।

৪৭. ম. মনিরউজ্জামান, সাধক কবি লালন : কালে উত্তর কালে, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১০, পৃ. ৬৪

৪৮. লালন স্মারকগ্রন্থ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

৪৯. ডক্টর খোন্দকার রিয়াজুল হক সম্পাদিত লালন-মৃত্যুশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, ঢাকা : লালন পরিষদ কেন্দ্রীয় সংসদ, ১৯৯২, পৃ. ৭-৮

এছাড়াও সিরাজ সাঁই সম্বন্ধে উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি সঙ্গীতপ্রিয় সাধক ছিলেন এবং মাঝে মধ্যে নিজেও গান বাঁধতেন। তবে এক্ষেত্রে বলিষ্ঠ কোন প্রমাণ আজও পাওয়া যায়নি। এস. এম. লুৎফর রহমান সিরাজ সাঁই রচিত বলে একটি গান উদ্ধার করেন বাউল কবি ও গায়ক মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের কাছ থেকে ১৯৬৮ সালে। গানটি এরূপ—

আঠারো মোকামের খবর
বুঝে লও তাই হিসাব ক'রে।
আছে আউয়ল মোকাম
রাগের তালা
পাঁচ পাঞ্জাতন সেই ঘরে।
হীরে বাই আর কষ্টি কান্তি
সেই ঘরে মনুরায় শান্তি
ঘুচলো না তোর মনের ভ্রান্তি
বেড়াচ্ছ ঘুরে ॥

সেই মোকামে কালা যারা
চার মোকামে বয় চার ধারা
চার ফেরেস্তা আছে খাড়া
খুঁজে দেখ অন্তঃপুরে ॥

তার উপরে আর আসেমা
জাননা তার মহিমা
পুলছেরাতের হয় সে সীমা
সাধনের জোরে ॥

সেই মোকামে হয় যে বাল্‌কা
ছেরে তার ছের ছিল্‌কা
গলে আছে তছবি খিলকা
(সে) অবহেলে যার ত'রে ॥

আরশ কুরছী লওহ কলম
তার উপরে আল্লার আলম
তার উপরে ঘুরছে কলম
কোবলতি ধরে ॥

আছে তার উপরে আলেক ধনি
সেথায় খবর নিচ্ছে কাদের গণি
হজরৎ মোহাম্মদের মোকাম সদর
সিরাজ দরবেশ তাই নিহারে।[৫০]

তবে গানটির ব্যাপারে লুৎফর রহমান নিজেও সন্দিহান; তারপরেও তিনি উল্লেখ করেছেন গানটির কাঠামো ও রচনাগত কৌশলে লালন পূর্ববর্তী যুগের; এটি সিরাজ সাঁই রচিত গান এমন ধারণা পোষণ করা সমীচীন নয়। বরং তাঁর সম্বন্ধে একথাটি প্রযোজ্য—"তিনি (সিরাজ) ছিলেন উচ্চাঙ্গের জ্ঞানী ও

৫০. ডক্টর এস. এম. লুৎফর রহমান, লালন-জিজ্ঞাসা, ঢাকা: ধারণী সাহিত্য সংসদ, ২০০৫, ২য় সংস্করণ পৃ. ২১-২২

সাধক—প্রকৃত দরবেশ। মুসলমান হইলেও হিন্দুদের বহুতীর্থে তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ অঞ্চলের সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিবর্জিত ফকিরি ধর্মের অন্যতম আদি গুরু। এই জ্ঞানী ও সাধক-গুরুর প্রভাব লালনের জীবনকে নূতনভাবে গঠিত করিয়াছিল।"[৫১]

লালন তাঁর একাধিক গানের ভণিতায় যেমন সিরাজ সাঁইকে উল্লেখ করেছেন, তেমনি কিছু গুরুবাদী বা মুর্শিদবাদী গানে তিনি এমন শ্রদ্ধাভাবে গুরুর কথা উল্লেখ করেছেন—

আমি বলি তোরে মন, গুরুর চরণ কর রে ভজন।
গুরুর চরণ পরম রতন কর রে সাধনা ॥

লালনের ২৬ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৭৯৮ সালে সিরাজ সাঁই মৃত্যুবরণ করেন। সিরাজ সাঁই সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে এসব তথ্য পাওয়া যায়।

লালন-রবীন্দ্র সাক্ষাৎ পর্ব

উপযুক্ত কোন তথ্য-প্রমাণ না থাকায় লালন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। তাই কেউ বলেন তাঁদের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়েছিল, কেউ বলেন হয়নি। তবে কুষ্টিয়ার শিলাইদহে জমিদারী দেখাশুনার প্রয়োজনে ঠাকুরবাড়ি কুঠি আজও রয়েছে। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন এস্টেট দেখাশুনার ভার পেলেন তখন তিনি সপরিবারে এখানে অবস্থান করেছিলেন। কুষ্টিয়া রেলস্টেশনের কাছেই 'টেগোর এ্যান্ড কোম্পানী' নামে একটি বাড়ি আছে।[৫২] ঠাকুর পরিবারের সদস্যরা কখনো কখনো এখান থেকে গড়াই নদীতে বোটে করে পদ্মানদী দিয়ে শিলাইদহে যেতেন। এছাড়াও স্থল পথেও গড়াই নদী পার হয়ে শিলাইদহে যাওয়া যায়। দূরত্ব মাত্র ছয়/সাত কিলোমিটার। ১৮৮৬ সাল হতে ১৮৯০ সালের মধ্যে একাধিকবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিলাইদহে যাতায়াত করেছিলেন। তবে লালনের মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিলাইদহে সপরিবারে আসেন এবং ১৮৯০ সালে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে তিনি যে বিলাতে ছিলেন তা ছিন্নপত্রে পাওয়া যায়।[৫৩]

ইতোমধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিভিন্ন বাউলের গান শুনেছেন এবং গগন হরকরার গান প্রত্যক্ষভাবে শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। এবং তিনি তো অবশ্যই লালনের গান শুনে থাকবেন। কেননা অত্র অঞ্চলে তখন লালনের যশ-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে।

শ্রী শচীন্দ্রনাথ অধিকারী যিনি শিলাইদহে এস্টেটের কর্মচারী ছিলেন। তাঁর 'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে লালন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাক্ষাতের বিষয়ে তিনি বলেন যে, ছেঁউড়িয়া থেকে অন্তত ষোল/সতের জন লোক জমি জমার দরবার নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে এসেছিলেন, তাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ছিলেন যার গায়ের রং ফর্সা, মুখে বসন্তের দাগ, মাথায় লম্বা চুল ঝুঁটি করে বাঁধা। চেহারাখানা বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করবার। কিন্তু প্রজাদের দরবারে গোলমালের জন্য রবীন্দ্রনাথ সেই বৃদ্ধের পরিচয় নিতে পারেন নি। তবে ফিরে যাওয়ার সময় বৃদ্ধ তার সাপমুখো লাঠিটি ফেলে যান। পরবর্তীতে যেদিন তিনি তার লাঠিখানা নিতে আসেন ঐদিনেই রবীন্দ্রনাথের সাথে তার দেখা হয়, আলাপ হয় এবং ভাবের আবেশে স্বয়ং লালন রবীন্দ্রনাথকে "আমি একদিনও না দেখিলাম তারে" তাঁর রচিত গানটি গেয়ে শোনান।[৫৪] কিন্তু গ্রন্থের পাদটীকায় জানা যায় এ সাক্ষাৎকারটি রবীন্দ্রনাথের নয়, তাঁর অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে।[৫৫] অবশ্য রবীন্দ্র সাক্ষাৎকার বিষয়টি প্রথম উল্লেখ করেন

৫১. বাংলার বাউল ও বাউল গান, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯
৫২. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪.
৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪।
৫৪. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, পলণ্টীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা : বৃন্দাবন ধর এন্ড সন্স্ লিমিটেড, ভাদ্র, ১৩৫২, পৃ. ৩-৫ (২য় সং.)।
৫৫. লালন স্মারকগ্রন্থ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬।

জলধর সেন তাঁর 'কাঙাল জীবনী' নামক গ্রন্থে, যা রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় রচিত হয়েছিল। কিন্তু তখনও এর পক্ষে বিপক্ষে কোন আলোচনা না পাওয়ায় বিষয়টি সুরাহা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বন্ধুকে লেখা চিঠির অংশবিশেষ থেকে পাওয়া যায়—

> "তুমি তো দেখেছো, শিলাইদহে লালন শাহ ফকিরের শিষ্যদের সহিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার কিরূপ আলাপ জমত। তারা গরীব। পোশাক-পরিচ্ছদ নাই। দেখলে বোঝবারও জো নাই তারা কতো মহৎ। কিন্তু কতো গভীর বিষয় কতো সহজভাবে তারা বলতে পারে। তেমন করে আলাপ করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী এম-এ, বি-এ দেরকেও দেখিনি।"[৫৬]

এথেকে অনুমিত হয় লালনের বহু শিষ্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যথেষ্ট সখ্যতা ছিল। কিন্তু লালনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ দেখা-সাক্ষাত বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন আলোচনায় পাওয়া যায়নি। রবীন্দ্রনাথের আঁকা অসংখ্য চিত্রেও লালন অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২২ 'হারামণি' বিভাগে চার কিস্তিতে ২০টি গান প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষা ছন্দ ও ধর্ম-দর্শন আলোচনায় লালনের প্রসঙ্গ বহুবার উল্লেখ করেছেন। এবং এক সময় নিজেকে 'রবীন্দ্র-বাউল' বলে লালনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। লালনের মৃত্যুর পর অর্ধ শতকাল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেঁচেছিলেন কিন্তু কোথাও সাক্ষাৎকার বিষয়টি পরিষ্কার হয়নি। লেখালেখি, কর্মব্যস্ততা, জমিদারী দেখাশুনা বৈষয়িক নানা কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে এ সাক্ষাৎ হয়নি নাকি ব্যক্তি লালনের চেয়ে সাধক লালনই ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরম প্রিয় কিংবা অন্য কোন কারণ যা আজও এক রহস্যময় অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে।

লালন শাহ ও কাঙাল হরিনাথ

উনিশ শতকে সংবাদ সাময়িকপত্র পরিচালনার জগতে এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি কাঙাল হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-৯৬)। লালন শাহ ও কাঙাল উভয়ই বাস করতেন কলকাতা জোড়াসাঁকো ঠাকুর জমিদারের বিরাহিমপুর (শিলাইদহ) পরগনায়। কাঙাল কুঠি আর ছেঁউড়িয়ার দূরত্ব ছিল মাত্র ৮/৯ মাইল।[৫৭] জমিদারী সেরেস্তায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগমনে পূর্বে শাহাজাদপুর ও বিরাহিম পরগনায় বেশ কয়েকবার কৃষক বিদ্রোহ ঘটে; উল্লেখ্য যে জমিদারপুষ্ট আমলা ও কর্মচারীদের প্রজাপীড়ন এবং অত্যাচারের কাহিনী তাঁর 'গ্রামবার্তা'য় প্রকাশ করলে তিনি জমিদারদের বিরাগভাজন হয়ে পড়েন এবং এক পর্যায়ে জমিদারদের বিশাল লাঠিয়াল বাহিনী প্রেরণ করা হয় তাঁকে শায়েস্তা করার জন্য। এরূপ অবস্থায় ফকির লালন শাহ তাঁর অনুসারীদের নিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেন। এ তথ্যটি হেমাঙ্গ বিশ্বাসের (১৯১২-৮৭) কাঙাল হরিনাথের অপ্রকাশিত 'দিনপঞ্জি' থেকে পাওয়া যায়।[৫৮] এরূপ প্রতিকূল পরিবেশে কাঙাল যেমন ছিলেন নির্ভেজাল মফঃস্বল সংবাদকর্মী, অন্য দিকে লালন ছিলেন মানুষতত্ত্বে বিশ্বাসী এক উদাসীন বাউল। দুজনেরই সাধনা মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের পথকে আবিষ্কার করা। লালন শাহ ও কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের ঘনিষ্ঠতার আরও পরিচয় রয়েছে অন্য একটি সূত্র থেকে—একদিন প্রাতঃকালে লালন শাহ তাঁর বিখ্যাত গান—

আমার ঘরের কাছে আরশীনগর
তাতে এক পড়শী বসত করে।

গানটি শোনালে কাঙাল অত্যন্ত মুগ্ধ হন।[৫৯] এ মুগ্ধতায় তিনি নিজেও বাউলদের নিয়ে দল গঠন করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়—

> "বাংলা ১২৮৭ সালে ফিকির চাঁদ ফকিরের বাউল গানের দল গঠিত হয়। এই দলকে লোকে 'ভুতের দল'ও বলত। কাঙাল হরিনাথের এ দল গঠন ও বাউল গান রচনা প্রেরণা এসেছিল বাউল সাধক লালন ফকিরের (১৭৭৪-১৮৯০) নিকট থেকে। পূর্ব থেকেই লালনের সঙ্গে কাঙালের

৫৬. উদ্ধৃত, লালন-মৃত্যুশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭
৫৭. সাধক কবি লালন : কালে উত্তর কালে, পূর্বোক্ত, পৃ.১৭
৫৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯
৫৯. আবুল আহসান চৌধুর সম্পাদিত কাঙাল হরিনাথ মজুমদার স্মারকগ্রন্থ, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮, পৃ. ১২৫

> ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সেই অন্তরঙ্গতার সূত্রে লালন মাঝে মধ্যে কুমারখালীতে কাঙাল কুটিরে আসতেন। অপর দিকে কাঙালও গিয়ে আসর জমাতেন ছেঁউড়িয়ায় লালনের আখড়ায়।"[৬০]

লালন শাহের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বের মেলবন্ধনে তিনিও বাউল গান রচনা করেছেন; জমিদার কিংবা সামন্তবাদীদের নির্যাতনের চিত্র তাঁর মোটেই ভাল লাগেনি; তাইতো লালন-দর্শনে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন মানবপ্রেমের এক মহান আহ্বানে যা সুরে-ছন্দে ও বাণীতে হয়ে উঠেছে শাশ্বত প্রেমময়।

ছেঁউড়িয়া আখড়া

লালন-জীবনী আলোচনার এক গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ হচ্ছে ছেঁউড়িয়া আখড়া। মূলত এ আখড়া থেকে তাঁর সাধন-ভজন, সঙ্গীত-দর্শন চর্চা থেকে আজকের লালন বিশ্বসভায় আলোচনায় উঠে এসেছেন। যতদূর জানা যায়, দীক্ষাগুরু সিরাজ সাঁইয়ের তিরোধানের পর থেকেই গুরুর অছিয়ত অনুযায়ী 'খিলকাঝোলা' পরিহিত হয়ে দেশ পরিভ্রমণে কিংবা তীর্থ ভ্রমণে তিনি বের হন জ্ঞানার্জনে নিজেকে ঋদ্ধ করার অপার বাসনা নিয়ে—তৎকালীন বাংলার রাজধানী নদীয়া, গয়া-কাশি-বৃন্দাবনসহ ভারতের বিভিন্ন জায়গা তিনি পরিভ্রমণ করেন। ভ্রমণে তিনি বহু মুনি-ঋষী, জ্ঞানী-গুণী ধর্মবেত্তার সংস্পর্শে আসেন এবং জ্ঞান-ধর্ম-মানুষের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও করণীয় বহুবিধ ব্যাপারে জ্ঞানার্জনে সক্ষম হন। এরূপ জ্ঞানার্জনে তাঁকে এতটাই সমৃদ্ধ করে যে, কোন জাত-পাত ও ধর্ম বিষয়ক আলোচনায় তাঁর মৌলিক মতামত জানালে তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এভাবেই প্রায় যুগাধিক কাল অতিবাহিত হলে প্রয়োজন হয় একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসে এগুলোর চর্চা করা, সংগীত পরিবেশন করা ও প্রচার করা। বড় কথা হলো ইতোমধ্যে তাঁর আলাপ-আলোচনায় ও সংগীতচর্চায় বাউল অনুসারী এসে দলে দলে লালন-শিষ্যের সৃষ্টি হয়। তাঁদের একান্ত অনুরোধে এবং ধর্ম চর্চার প্রয়োজনে নিরাপদে সাধনকর্মের নিমিত্তে বর্তমান কুষ্টিয়া শহর থেকে পাঁচ কি. মি. দূরে গড়াই নদীর তীরে ছেঁউড়িয়া নামক এক প্রশান্ত পল্লীতে গড়ে উঠে এই ছেঁউড়িয়া আখড়া। আর এই আখড়া থেকে তিনি নিমগ্ন হন তাঁর ধর্মীয় আলাপ-আলোচনা ও সঙ্গীতের মাধ্যমে সাধনতত্ত্ব প্রচারে। আর এই আখড়ায় তিনি তাঁর জীবনের সুদীর্ঘ প্রায় ৭৫ বছর অতিবাহিত করেন এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী এখানেই তিনি চিরদিনের জন্য শায়িত হন।

আর এই আখড়া স্থাপনে স্থানীয় ফকির সম্প্রদায়ের উদার সাহায্য সহযোগিতা উল্লেখ করার মত। কেননা কারিগর সম্প্রদায়ের প্রায় প্রতিটি পরিবার ছিল অত্যন্ত লালন-ভক্ত ও অনুসারী। তাঁদের এরূপ অকৃত্রিম শ্রদ্ধাভক্তি লালনের প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করে তোলে। তিনি সর্বদা তাঁর শিষ্য-মণ্ডলী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন, আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে গান বাঁধতেন, তাঁর অন্যতম শিষ্য মনিরুদ্দিন শাহ এগুলো লিখে রাখতেন। তবে এখানে শুধু তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর বিচরণ ছিল না, মাঝে মধ্যে স্থানীয় শিক্ষিত-সুধীজন আসতেন এবং এছাড়াও লালনের বাউল ধর্মমতকে তীব্রভাবে প্রতিরোধ করার মানসে এই আখড়ায় অনেকে বাহাসে লিপ্ত হতেন এবং শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে তখনই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে দীক্ষা নিতেন। এঁদের মধ্যে মনিরুদ্দিন শাহ উল্লেখযোগ্য।[৬১] আবার এ আখড়া থেকেই তিনি বিভিন্ন স্থানে আলোচনায় যেতেন সাধুসঙ্গে উপস্থিত হতেন। এমনিভাবে এই আখড়া পরিণত হয় সাধুর বাজারে, গড়ে উঠে লালন-মণ্ডলী। এই আখড়ায় অবস্থান করে তিনি একাধিক সাধন-সঙ্গিনীও গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন লালমতি, কেউ বলে মতিবিবি, বিশাখা প্রমুখ। কেউ এ বিশখাকে সরাসরি লালনের স্ত্রীরূপেও উল্লেখ করেন। পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, তাঁর স্ত্রী নয় বরং সাধন-সঙ্গিনী

---

৬০. আবুল আহসান চৌধুরী, কাঙাল হরিনাথ : গ্রামীণ মনিষার প্রতিকৃতি, ঢাকা : অম্বেষা প্রকাশন, ২০০৮, পৃ. ৫৪
৬১. লালন শাহ : জীবন ও গান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪

কিংবা ধর্মপত্নীও বলা যায়। তিনি বাউল ধর্ম মতানুযায়ী কোন সন্তান সন্ততির জন্ম দেননি বরং তাঁর একজন পালিত কন্যা ছিল তার কথা জানা যায়।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি যে সম্পত্তি উইল করে যান; তাতে তাঁর স্ত্রী, পালিতকন্যা ও প্রিয়শিষ্য শীতলকে বণ্টন করে যান। ছেঁউড়িয়ায় লালন শিষ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন—শীতল শাহ, ভোলাই শাহ, মহরম শাহ, মানিক শাহ, কুধু শাহ, পাঁচু শাহ, দয়াল শাহ, ভাঙ্গুরী ফকিরণী, দুদ্দু শাহ, পাঞ্জু শাহ, চক্কর শাহ, ফক্কর শাহ, মলম শাহ, কোরবান শাহ, মনিরদ্দিন শাহ প্রমুখ।[৬২] গবেষণায় পাওয়া গেছে লালন জীবন সায়াহ্নে প্রায় দশ সহস্রাধিক শিষ্যের সাধুবাজার তিনি তৈরি করে যান।

লালন শাহের জমি পত্তনি-দানের পাট্টা

তিনি সুদীর্ঘ জীবনে প্রায়ই নিরোগ ছিলেন, সামান্য অসুস্থতায় তিনি সংগীত রচনা ও ধর্মালাপে সুস্থ হয়ে উঠতেন। তাঁর জীবিকার অন্যতম উপায় ছিল ভিক্ষাবৃত্তি। অবশ্য অনেকেই এমতের বিরোধিতা করেছেন কেননা বাউল মতে 'আচলা-ঝোলা' অর্থাৎ খিলকা পরিহিত হলেই তার যত সম্পদই থাক, তাকে তার অহংকার পরিহারের নিমিত্তে ভিক্ষা করতে হয়, কাজেই একে ভিক্ষাজীবী বলা সমীচীন নয়। বরং শিষ্য-ভক্ত মণ্ডলীর দান অনুদানে তাঁর প্রাত্যহিক জীবন চলত। এছাড়া কেউ কেউ মনে করেন, তিনি আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা জানতেন তাতেও রোজগার হত। তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত অশ্বারোহণে যে দক্ষ ছিলেন এর প্রমাণ রয়েছে এবং যে কোথাও কোন সাধু বৈঠকে নিমন্ত্রণ করলে সেখানে তিনি উপস্থিত হতেন এবং এরূপ সাধুসঙ্গে ফেরার সময় সাধু-গুরুদের সম্মানী আজও প্রচলিত।

বসন্ত কুমার পালের তথ্য থেকে জানা যায়, লালনের জীবদ্দশাতেই ছেঁউড়িয়াতে 'ভাণ্ডারা' অর্থাৎ বার্ষিক উৎসবের ব্যবস্থা হয়। এ উৎসবে প্রায় সহস্রাধিক শিষ্যমণ্ডলী সমবেত হন এবং সংগীতচর্চা ও

৬২. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত পৃ. ৪২

ধর্মালোচনা করেন। এতে প্রায় ৫/৬ শত টাকা খরচ হত।[৬৩] এভাবেই বাউলধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে গানের মাধ্যমে প্রচার করে, শিষ্য গ্রহণ করে ও বার্ষিক উৎসবাদির মধ্য দিয়ে লালন এর একটি স্থায়ী রূপ দিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আখড়া থেকেই একসময় কাঙাল হরিনাথ জমিদারপুষ্ট গুণ্ডা বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হলে লালন তাঁর শিষ্যমণ্ডলীসহ-এর প্রতিরোধে অগ্রসর হন। আবার এই বিরাহিমপুর পরগনার জমিদার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে আখড়া থেকে ডেকে নিয়ে শিলাইদহের কুটিবাড়িতে ধর্মালাপে মশগুল হতেন। অন্যদিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বোটে ডেকে পদ্মার কোলে আলাপ-আলোচনায় তাঁর একটি প্রতিকৃতি আঁকেন, তাঁর সহধর্মিনী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁর গানের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই আখড়া থেকে তাঁর গান সংগ্রহ করে প্রকাশ করে তাঁর খ্যাতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেন। আখড়ার প্রাথমিক অবস্থা সম্বন্ধে একজন গবেষক বলেন—

প্রথমত, আখড়ায় খড়ের ছাউনি দেওয়া এবং শালের খুটির উপর নির্মিত ঘর ছিল। তিন কামরা বিশিষ্ট ২৫ হাত দৈর্ঘে এবং ১৬ হাত প্রস্থে এঘরটির এক কামরায় লালন তাঁর সাধন-ভজন করতেন অন্য দুটি কক্ষে ছিল শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীর জন্য।[৬৪] লালনের মৃত্যুর পর থেকে যথারীতি ফাল্গুন বা চৈত্র মাসের দোল পুর্ণিমায় 'সাধু সেবা' আয়োজন চলতে থাকে। ১৯৫৯ কিংবা ১৯৬০ লালন স্মরণোৎসবে লালনের গানের সংগ্রাহক ও নিষ্ঠাবান গবেষক মনসুর উদ্দীনসহ আরো অনেক মান্য বিজ্ঞজনের বদান্যতায় স্থানীয় ধনাঢ্য ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীদের আর্থিক প্রচেষ্টায় ও আন্তরিকতায় উপমহাদেশের আরেক জ্ঞানী-ব্যক্তিত্ব হযরত নিজামউদ্দিন আওলিয়ার মাজারের অনুসরণে নকশা তৈরি করে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এরূপভাবে এখানে ধীরে ধীরে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার ফলে আখড়ায় নির্মিত হয় লালন মাজার, লালন একাডেমী, গ্রন্থাগার এবং লালন কমপ্লেক্স। কালীগঙ্গার তীরেই গড়ে উঠে বিশাল আয়তন জুড়ে লালন মঞ্চ।

বর্তমানে লালন একাডেমী ও মাজার কমিটি দোলপূর্ণিমা ও ১ কার্তিকে দুটি অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। আলোচনা, সঙ্গীতানুষ্ঠান ও মেলা এরূপ আড়ম্বর আনুষ্ঠানিকতায় লালন স্মরণোৎসব এবং অন্যদিকে 'সাধুসঙ্গ' অনুষ্ঠিত হয়।[৬৫] আখড়ায় এরূপ দৃশ্যের বর্ণনা পাওয়া যায়—

> "সূর্যের আলো ফোটার আগেই তাঁদের দিন শুরু হলো। বিপুল সংখ্যক বাউল ও লালনভক্ত কর্তৃপক্ষের দেওয়া সকালের নাস্তা পায়েস ও মুড়ির 'বাল্যসেবা' গ্রহণ করেছেন। দুপুরে তাঁরা মরা কালিগঙ্গায় গোসল সেরে মাছ, ভাত ও ত্রিব্যঞ্জন দিয়ে (তিন ধরনের সবজি দিয়ে তৈরি তরকারী) দুপুরের খাবার গ্রহণ করেছেন। জাত, কুল, ধর্ম, পাত্র ভুলে একে অন্যের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করছেন-তাঁরা।"[৬৬]

ছেঁউড়িয়া আখড়া আজ লালনভক্তদের ও সাধকদের জন্য তীর্থস্থান, সাধারণ দর্শকদের পবিত্র স্থান।

ধর্মমত

লালনের ধর্মমত আলোচনায় একটি বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় যে, লালন পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত কোন ধর্ম পালন করেননি। বরং তিনি যে ধর্মের অনুসারী ছিলেন তা বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়, গুরুবাদী-দেহতত্ত্বভিত্তিক-ইন্দ্রিয়নিরোধক অধ্যাত্মসাধনা নির্ভর মরমি ভাববাদ অর্থাৎ বাউল ধর্ম। এ ধর্মে গুরুর প্রাধান্য সর্বাধিক, এ ধর্মের ক্ষেত্র হচ্ছে স্বয়ং দেহ, ইন্দ্রিয়দমন আর অধ্যাত্মসাধনা এর পদ্ধতিসমূহ, যাতে এক অনিন্দ্য মরমিয়া ভাববাদের জন্ম নেয়, যেখানে পাত্রের প্রয়োজন নেই,

---

৬৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

৬৪. সাধক কবি লালন : কালে উত্তর কালে, পূর্বোক্ত পৃ. ৮৩

৬৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫.

৬৬. মাহমুদ অনু তৌহিদী হাসান, দিন রাত বিরতিহীন গানের সুরে মোহিত ছেঁউড়িয়া, দৈনিক প্রথম আলো, ১৮-১০-২০০৯, পৃ. ২৩।

মসজিদ-মন্দির-গীর্জার স্থান নেই, যা পালনে বনে জঙ্গলে সন্ন্যাসব্রতে যেতে হয়না, বরং গৃহের স্বাভাবিক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে একে পালন করা যায়। আর মৌখিকভাবে পরিবেশিত বাউল গানই হচ্ছে এ ধর্মের প্রচার ও প্রসারে মূল হাতিয়ার। কোন ধর্মের সঙ্গে যেমন এর তুলনা নেই, তেমনি বিরোধ নেই বরং সকল ধর্মমতকে অস্বীকার করে সকল মানুষের জন্য নিহিত একটি বিশেষ ধর্মমত, যা সতত উদার, সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ এবং মানবিকবোধের এক জীবন্ত দলিল। এ ধর্মে 'বেদ-বিধি-শাস্ত্র' সর্বত্রই অসার ও অপাংক্তেয়। লালনের উচ্চারণ—

বেদে কি তার মর্ম জানে।
যেরূপ সাঁইর লীলা-খেলা
আছে এই দেহ-ভুবনে ॥[৬৭]

তেমনিভাবে সনাতন ধর্মের সনাতনী রীতি লালন-ধর্মমত এভাবেই পাশ কাটিয়েছে—

মাটির ঢিপি, কাঠের ছবি
ভূত ভাবে সব দেবাদেবী
ভোলে না সে এসব রূপি
ও যে মানুষ-রতন চেনে ॥[৬৮]

আবার ইসলাম ধর্মের শরিয়তি নামাজের তীব্র বিরোধিতা তিনি করেছেন; নামাজে রাকাত গোনাতেই রত থাকলে মূল উদ্দেশ্য সাধন হবে কিভাবে—

ছুন্নত নফল ফরজে
রাকাত-গোণা নামাজে
থাকলে এসব হিসাব-কিতাব
বর্জখ ঠিক রয় কিসে ?[৬৯]

উল্লেখ যে এরূপ ধর্মকর্ম পালনে জাত-পাতের ভেদাভেদকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় সর্বাগ্রে। কিন্তু লালন তাঁর ধর্মমতে জাত-ধর্মের গণ্ডির বাইরে এক উদার জমিনে সকল মানুষকে আহবান জানিয়েছেন। তাই তিনি মানুষের সর্বাঙ্গীন ধর্মকে মর্মহীন রূপে গ্রহণ করে পরম প্রত্যাশিত মনের মানুষকে পাবার ব্যাকুলতায় ভক্তি-শ্রদ্ধার কথাই উচ্চারণ করেছেন। আর এক্ষেত্রে ভক্তের কোন জাত পরিচয় নেই। লালন তাঁর গানে এভাবেই পরম সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন—

ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই
হিন্দু কি যবন বলে
তার জাতের বিচার নাই।

লালনের এ বাউলধর্ম দেহকেন্দ্রিক। আর তাঁর গানে যে, 'পরমপুরুষ', 'সহজ মানুষ', 'রসের মানুষ', 'অটল মানুষ', 'অধর মানুষ', 'ভাবের মানুষ', 'মনের মানুষ', 'অচিন পাখি', 'সাঁই', 'নিরঞ্জনে'র গুপ্ত উপস্থিতি এ দেহকে আশ্রয় করেই। আবার মানবদেহ 'ঘর' কখনো খাঁচা কখনো বা 'আরশিনগর' প্রভৃতি প্রত্যয়ে অভিহিত হয়েছে। কেননা বাউলধর্মে দেহ হচ্ছে পূর্ণ তীর্থ এবং এ বিষয়ে লালনের দৃঢ় উচ্চারণ—

আছে আদি মক্কা এই মানবদেহে
দেখ না রে মন ভেয়ে।
দেশ-দেশান্তর দৌড়ে এবার
মরিস কেন হাঁপিয়ে ॥[৭০]

আবার, বাউলেরা অধ্যাত্মসাধনায় স্রষ্টা কিংবা পরমপুরুষ বা পরমাত্মাকে অনুসন্ধান করেন এবং তাঁর সাথে মিলনের ব্যাকুলতায় বিভোর হবে ওঠেন। আর এ মিলনের ক্ষেত্র হচ্ছে দেহ। এবং নর-নারীর দেহজ-ইন্দ্রিয়জ সম্পর্কের সেতু নির্মাণ করেও ইন্দ্রাতীত জগতে উপনীত হতে প্রয়াস চালান।[৭১]

---

৬৭. লালন সাঁইয়ের সন্ধানে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩
৬৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭
৬৯. লালন-জিজ্ঞাসা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮
৭০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯-৪০
৭১. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা : প্রতিভাস, ১৯৬৪, পৃ. ১৬

আবার এ দেহের কোথায় ফুল ফুটে এবং অলি কি করে সেই মধুর রসাস্বাদন করে তার অন্বেষণ লালনের গানে বিদ্যমান—

কোমল ফোটা কারে বলি
কার মোকাম তার কোথায় গলি
কোন সময় পড়ে ফুলি
মধু খায় সে অলি জনা ॥[৭২]

আবার সাধনতত্ত্বের একান্ত কথায় লালনের উচ্চারণ এরূপ—

পূর্ণিমার যোগাযোগ হলে
শুকনা নদী উজান চলে
ত্রিবেণীর পিছল ঘাটে
নিঃশব্দে বন্যা ছোটে
চাঁদ-চকোরে ভাটার চোটে
বাঁধ ভেঙ্গে যায় তৎক্ষণা ॥

এরূপ সাধনতত্ত্বে কিভাবে পূর্ণিমার টানে শুকনা নদী প্লাবিত হয়ে উজান চলে এবং ত্রিবেণীতে বন্যার উদয় হয় এবং তা সমস্ত কিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ত্রিবেণী শব্দের ব্যাখ্যায় প্রতিমাসে প্রকৃতির রজঃস্রাব বলে উল্লেখ করেছেন এবং ত্রিবেণীর ত্রিধারা বিশিষ্ট নদী প্রবাহের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ কামকলা নিয়ন্ত্রিত করে শুদ্ধ প্রেমের মধ্য দিয়ে যথার্থ প্রেমের ঘাটে তরী ভিড়াতে হবে।

আর এরূপ প্রয়োজনেই কিংবা আত্মাধিক প্রয়োজনে হোক কিংবা পরম পুরুষের সান্নিধ্যের প্রয়োজনেই হোক গুরু আবশ্যক। আর তাঁর গানে উল্লেখ করেছেন, 'ধররে অধর চাঁদেরে অধরে অধর দিয়ে' এবং এখানে গুরু প্রয়োজন সর্বাগ্রে। তাই গুরু কিংবা মুরশিদ সম্বন্ধে যথার্থ লালনের বাণী—

মুরশিদ বিনে কি ধন আর আছে রে এ জগতে।
মুরশিদের চরণ-সুধা
পান করিলে হরে ক্ষুধা
কোরো না দেলে দ্বিধা
যেহি মুরশিদ সেই খোদা
বোঝ 'অলিয়ম মুরশেদা'
আয়েত লেখা কোরানেতে ॥[৭৩]

লালন গুরু নির্দেশিত পথেই আরশিনগরে তাঁর পড়শিকে সন্ধান করেছেন আর মানুষ-ভজনের মধ্য দিয়েই তিনি সকল কিছুর সমাধান পেয়েছেন এবং তাঁর প্রদর্শিত ধর্মপথেই 'ভেদবুদ্ধিহীন মানবতার উদার পরিসরে সাম্য ও প্রেমের সুউচ্চ মিনারে বসেই লালন সাধনা করেছেন।'[৭৪] আর মানব-মহিমা ও মানব-বন্দনার এ শাশ্বত বাণীই যেন তাঁর ধর্মতত্ত্বকে পরিপূর্ণ করেছে এভাবে—

মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি
মানুষ ছেড়ে ক্ষ্যাপারে, তুই মূল হারাবি।[৭৫]

লালনবিরোধী আন্দোলন

লালন শাহের জীবৎকালেই তাঁর বিরুদ্ধে নানা আন্দোলন শুরু হয়। আর এটা তখনই ব্যাপক আকার ধারণ করে যখন তাঁর রচিত গান, দর্শন-তত্ত্ব তাঁর অনুসারীদের মাঝে প্রচলিত হতে থাকে এবং গণমানুষকে স্পর্শ করতে থাকে ব্যাপকভাবে। তাই একদিকে যেমন তাঁর শিষ্য-ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি

৭২. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬
৭৩. লালন সাঁইয়ের সন্ধানে, পূর্বোক্ত পৃ. ৪২-৪৩
৭৪. লালন স্মারকগ্রন্থ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২
৭৫. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৯।

পেতে থাকে অন্যদিকে তাঁর বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটতে থাকে। তাই তাঁর জীবদ্দশাতে যেমন তিনি আদৃত হয়েছেন, তেমনি অপমানিত হয়েছেন। যুগপৎ এ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে লালন অগ্রসর হয়েছেন তাঁর সাধনার লক্ষ্য পথে। প্রচলিত শাস্ত্রধর্ম বিরোধী লালন হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের দ্বারা যেমন নন্দিত হয়েছেন, তেমনি হয়েছেন নিন্দিতও। একাধিক তর্ক-বিতর্ক কিংবা বাহাস এর মধ্য দিয়ে অনেকে তাঁকে পরাজিত করার বহু অভিযান পরিচালিত করেছে। তাঁর যোগ্য শিষ্যদের মধ্যে অনেকে এরূপ বাহাসে গিয়ে তর্কে বিতর্কে পরাজিত হয়ে শেষ পর্যন্ত শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। মৌলবী খবীরুদ্দিন লালন শাহকে শায়েস্তা করার জন্য এক মহিষের গাড়ি বোঝাই দলিল, হাদিসসহ লালনের কাছে উপস্থিত হলেন এবং প্রায় সাত দিন এভাবে বাহাস চলার পর শেষ পর্যন্ত তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এরূপভাবে যশোরের হরিণাকুণ্ডু এলাকার আলীপাড়া নিবাসী মনিরুদ্দিন শাহ বাহাসে পরাজিত হয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এমন উদাহরণ রয়েছে তাঁর শিষ্য চক্কর ও ফক্কর শাহের ক্ষেত্রেও এবং কুমারখালীর চারকোল গ্রামের মৌলবী ছায়েদ আলী ও মৌলবী নাসিরুদ্দিন তর্ক-বাহাসে পরাজিত হয়েই শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন।[৭৬] বিরোধ অভিযানে শরিয়তপন্থী মুন্সী-মোল্লা এবং নৈষ্ঠিক হিন্দু একসঙ্গে চালিয়েছিল। এছাড়া সুশিক্ষিত ব্যক্তিত্ব এবং বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল মীর মশাররফ হোসেনও লালন তথা সেখানকার বাউলদের এভাবে আক্রমণ করেছিলেন—

ঠেটা গুরু ঝুটা পীর
বালা হাতে নেড়ার ফকীর
এরা আসল শয়তান, কাফের বেঈমান
তাকি তোমরা জান না।[৭৭]

১৮৭৬ সালে প্রকাশিত মোহাম্মদ হাদেকের 'জালালাতোল ফোক্রা' গ্রন্থে বাউল ফকিরদের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষায় আক্ষেপ রয়েছে—

বে সরাহ ফকিরে দেশ ধ্বংস করে দিল।
তামাম লোকেরে তারা গোমরা করিল।[৭৮]

লালন শাহ তথা সমকালীন বাউলদের বিরুদ্ধে যে তীব্র ক্ষোভ তার প্রমাণ আছে লালন পরবর্তী নানা গ্রন্থে।

উনিশ শতকে বাউল মতবাদ যেমন প্রসার লাভ করে তেমনি 'ওহাবি', 'ফারায়াজি', 'আহালে হাদিস' প্রভৃতি ধর্মীয় সংস্কারের নামে যে আন্দোলন পরিচালিত হয়, তা বাউল সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের জন্য এক বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়াও মুনসী এমদাদ আলী (১৮৮১-১৯৪১) প্রণীত 'রদ্দে নাড়া' (রচনাকাল : ২৪ আষাঢ়, ১৩২৪), রংপুর নিবাসী মাওলানা বেয়াজউদ্দীন আহমদের 'বাউলধ্বংস ফৎওয়া' প্রভৃতি পুস্তক-পুস্তিকায় বাউলদের প্রতি তথা লালনের প্রতি তীব্র ক্ষোভ-ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ থেকে অনুমিত হয় লালন জীবদ্দশাতে এ আন্দোলনের তীব্রতা কত ব্যাপক ছিল।[৭৯]

প্রকৃতপক্ষে লালনবিরোধী আন্দোলনের ধারাবাহিকতার কোন ইতিহাস নেই। তৎকালীন তথ্য-উপাত্ত স্বল্পতা না হলে জানা যেত কি নির্মম ছিল সেই অধ্যায়। কত পাষণ্ড ছিল সেই সময়ের বর্বরতা।

৭৬. লালন শাহ : জীবন ও গান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩
৭৭. ডক্টর ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৭, পৃ. ৪৬২।
৭৮. উদ্ধৃত, লালন শাহ : জীবন ও গান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫
৭৯. লালন সাঁইয়ের সন্ধানে, পূর্বোক্ত পৃ. ৮৩

মানবতার ধ্বজাধারী লালনকেই সহ্য করতে হয়েছিল অমানবিক নির্যাতন। কিন্তু প্রাজ্ঞ লালন তাঁর গানে এগুলোকে অতিক্রম করে যেন প্রতিবাদ করেছেন অন্যভাবে অন্য অভিধায়—

একই ঘাটে আসা যাওয়া
একই পাটনী দিছে খেওয়া
কেউ খায়না কারও ছোঁয়া
বিভিন্ন জল কে কোথায় পান।[৮০]

প্রকৃতপক্ষে জাত-ধর্ম বিদ্বেষের বিরুদ্ধে লালনের এ প্রতিবাদ তাঁর ব্যক্তিজীবনে নির্মম উপলব্ধি তা তাঁকে যেমন অভিমানী করেছে তেমনি প্রতিবাদীও করেছে তাঁর দীর্ণ-বিদীর্ণ অন্তরকে। আর এরূপ বাদ প্রতিবাদের বেড়াজালকে ডিঙ্গিয়ে তিনি তাঁর জীবন সোপানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন মর্মে মননে আপন স্বকীয়তার ঔজ্জ্বল্যে। তারপরেও অকথ্য অত্যাচার, গঞ্জনার নির্মম চাবুকও লালন ও তাঁর শিষ্য সম্প্রদায়কে প্রতিনিয়ত তাড়িত করেছিল। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এ বিষয়ে এভাবে উল্লেখ করেছেন—

> "শরীয়তবাদী মুসলমানগণ লালনকে ভালো চোখে কোনদিনই দেখেন নাই। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল লালনের খ্যাতি-প্রতিপত্তির দিনেও তাঁহাকে নিন্দা করিয়াছে। ... সাধুসেবা নামে লালনের শিষ্য ও তাঁহার সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাভিচার চলে, এবং অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ইন্দ্রিয়-সেবায় রত থাকে বলিয়া লালনের শিষ্যদের সন্তানাদি হয় না। ইহাই ইসলাম-ধর্মাবলম্বীদের লালন ও তাঁহার সম্প্রদায়ের প্রতি ধারণা। এই বাউল-পন্থী নেড়ার ফকিরেরা চিরকাল ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে।"[৮১]

বস্তুনিষ্ঠ তথ্য-উপাত্ত পাওয়া গেলে বাউলবিরোধী তথা লালনবিরোধী আন্দোলন যে কত মর্মান্তিক ছিল তার সমুদয় পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হত।

লালন প্রতিকৃতি

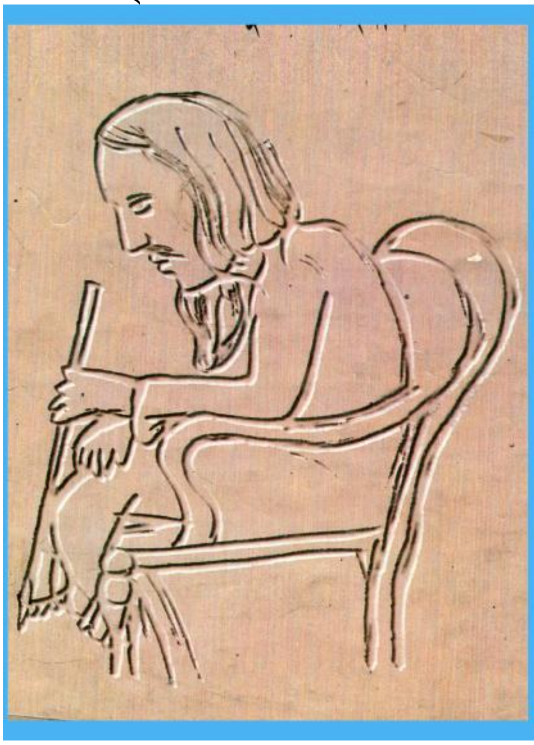

আলোকচিত্র নং : ১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত প্রতিকৃতি

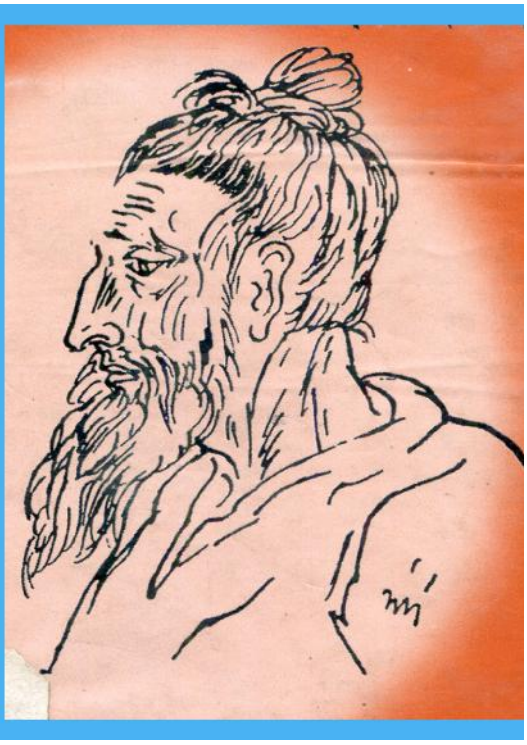

আলোকচিত্র নং : ২ নন্দলাল বসু অঙ্কিত প্রতিকৃতি

৮০. অন্নদাশঙ্কর রায়, লালন ও তাঁর গান, কলিকাতা : শৈবা, প্রকাশন বিভাগ, ১৩৮৫, পৃ. ৭২
৮১. বাংলার বাউল ও বাউল গান, পূর্বোক্ত, পৃ.১২.

লালনের চেহারা কিরূপ ছিল এবং দেখতে কেমন ছিলেন এরূপ বিষয় নিয়ে কৌতূহলের জন্ম স্বাভাবিক, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লালনপন্থী ফকির খোদাবক্‌শ শাহের জবানীতে উল্লেখ করেছেন যে, লালনের মাথায় বাবরি চুল, মুখে দাড়ি ছিল এবং একটি চক্ষু দৃষ্টিহীন ছিল। আরেক চক্ষে ছিল এক গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি।[৮২] ভোলানাথ মজুমদারও লালনের অনুরূপ চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন। ফকির খোদাবক্স শাহ ও ভোলানাথ দুজনেই লালনকে প্রত্যক্ষ করেছেন। সেদিক থেকে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং অক্ষয়কুমার কেউই লালনকে প্রত্যক্ষ করেননি। লালনকে প্রত্যক্ষ করার বিরল গৌরবের অধিকারী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দী এবং সম্ভবত রবীন্দ্রনাথও।[৮৩] তবে একমাত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮৯ সালের ৫ মে (২৩শে বৈশাখ ১৯২৬) শিলাইদহে বোটের উপর লালন ফকির নামে একটি স্কেচ পেন্সিল দিয়ে অঙ্কন করেন।[৮৪] এ সুবাদে লালনকে প্রত্যক্ষ করার একটি দলিল তিনি উপস্থাপন করেছেন। তাঁর অঙ্কিত ছবি থেকে বোঝা যায় লালন একটি আরাম কেদারায় বসে আছেন, তাঁর মাথায় বাবরি চুল ও মুখে দাড়ি আছে, গোঁফও আছে। গায়ে পাঞ্জাবি জাতীয় পোশাক এবং হাতে একখানা লাঠি, তিনি সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে আছেন; বয়সের ভারের জন্য এরূপ হয়েছে। চেয়ারের পিছনে বাংলায় উপর-নিচে 'লালন ফকীর' ও 'শিলাইদহ বোটের উপর' এবং চেয়ারের নিচে ইংরেজিতে উপরে-নিচে শিল্পীর নাম ও তারিখ দেওয়া আছে। এ ছবি থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় এটি লালনের প্রকৃত প্রতিকৃতি।[৮৫]

কিন্তু অজ্ঞাত কারণে দীর্ঘকাল এ প্রতিকৃতি লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। নন্দলাল বসু অঙ্কিত লালনের প্রতিকৃতিটি জনসম্মুখে প্রচার লাভ করে। তখন অনেকে এটাই লালনের প্রতিকৃতি হিসেবে মেনে নিয়েছিল।

সনৎকুমার মিত্র এবং তুষার চট্টোপাধ্যায় ১৯৭৬ সালের দিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রতিকৃতিটা আবিষ্কার করেন।[৮৬] লালন গবেষক সনৎকুমার মিত্র উল্লেখ করেন ...'দীর্ঘ ছিয়াশি বছর পরে আমি তাঁকে প্রকাশ্যে লোক-চক্ষুর সামনে হাজির করলাম।'[৮৭] কিন্তু ছবি দুটি নিয়ে মতপার্থক্য লালনের জীবনের অন্যান্য ঘটনার মত প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। নন্দলাল অঙ্কিত ছবিতে লালনের মাথায় চূড়াবাঁধা চুল, গায়ে খিলকা জাতীয় পোশাক, গোফ-শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখ, উন্নত নাসিকা, আয়ত চোখ দেখা যায়। ছবি দুটি পাশাপাশি রেখে পর্যবেক্ষণ করলে দু'টি ছবির মধ্যে সাদৃশ্য অনেক শুধু বৈশাদৃশ্য কেবল ঝুঁটি ও বাবরির মধ্যে।[৮৮] নন্দলাল ছবিটিকে আকর্ষণীয় করার জন্য এরূপ করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মত নন্দলাল বসুও বাম দিক থেকে ছবিটি এঁকেছেন। কিন্তু অনেক গবেষকের ধারণা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি অবলম্বনেই তিনি হয়ত এরূপ ছবি এঁকেছেন। তবে আরও সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দুটি ছবিতে পার্থক্য অনেক, যেমন—ঝুঁটি বাধা চুল, বয়স, মুখাবয়ব, পোশাক ইত্যাদি। ছবিতে শান্তিনিকেতন আশ্রমের সদস্য নন্দলাল বসুর ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতির একটি সূক্ষ্ম প্রভাব ছবি অবয়বে দেখা যায়। আর লালনের মৃত্যুর ছাব্বিশ বছর পর এ আঁকা ছবিটি কোনক্রমেই লালনের নয়, এমনকি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রতিছবির অনুকরণেও নয়, বরং কোন বাউলের কল্পিত ছবি। তবে এক্ষেত্রে চিত্র-বিশেষজ্ঞ ছাড়া সঠিকভাবে কোন মন্তব্য না করাই শ্রেয়।

৮২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৫
৮৩. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত,, পৃ ৪৩
৮৪. Samir Dasgupta, Songs of Lalon, Dhaka : Shahitya Prokash, 2000, P.9
৮৫. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪
৮৬. মুহম্মদ আবু তালিব, প্রসঙ্গ লালনের ছবি, দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ১১ শ্রাবণ ১৩৯৭, পৃ.৯
৮৭. লালন ফকির : কবি ও কাব্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২
৮৮. লালন সাঁইয়ের সন্ধানে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

মৃত্যু ও সমাধি

ছেঁউড়িয়া আখড়াতেই জীবনের শেষ দিন অতিবাহিত করেন। এখানে যে 'লালন-মণ্ডলী' বা 'সাধুর বাজার' গড়ে উঠেছিল তাঁকে ঘিরেই, শিষ্য-অনুরাগী ভক্তদের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল। 'হিতকরী' পত্রিকার মারফতে জানা যায়, জীবনের শেষ পর্যায়েও তিনি শক্ত-সামর্থ্যবান ছিলেন। তখনও তিনি অশ্বারোহণে বিভিন্নস্থানে যেতেন। শেষজীবনের জীবিকার দায়িত্ব তাঁর শিষ্য-ভক্তরাই গ্রহণ করেছিলেন। উক্ত পত্রিকাতে মৃত্যুর পূর্বে ঘটনার বর্ণনা এরূপ—

> "মৃত্যুর প্রায় একমাস পূর্ব্ব হইতে ইহার পেটের ব্যারাম হয় ও হাতে পায়ের গ্রন্থি জলস্ফীত হয়। দুধ ভিন্ন পীড়িত অবস্থায় অন্যকিছু খাইতেন না। মাছ খাইতে চাহিতেন। পীড়িতকালেও পরমেশ্বরের নাম পূর্ব্ববৎ সাধন করিতেন; মধ্যে মধ্যে গানে উন্মত্ত হইতেন।"

লালনের অন্তিম মুহূর্তের বর্ণনায় বসন্তকুমার পাল বলেছেন :

> "...প্রভাতরশ্মি পূর্ব্বাশার অন্তর ফুটিয়া লোকলোচনে দর্শন দিল, সাঁইজীর সঙ্গীতও শেষ হইল, স্বরলহরী থামিয়া গেল। সমস্ত গৃহতল নীরব নিস্তব্ধ, ইহার পর শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া 'আমি চলিলাম' বলিয়া তাঁহার কণ্ঠ হইতে শেষ স্বর উচ্চারিত হইলো, নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিলেন, সামজপরিত্যক্ত দীন ফকিরের জীবননাট্যের যবনিকাপাত হইল।"[৮৯]

১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর বাংলা ১২৯৭ সনের ১ কার্তিক শুক্রবার ভোর পাঁচটায় ১১৬ বছরে লালনের জীবনাবসান ঘটে। 'হিতকরী'র বিবরণে পাওয়া যায় :

> "মৃত্যুকালে কোনো সম্প্রদায়ী মতানুসারে তাঁহার অন্তিমকার্য্য সম্পন্ন হওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ও উপদেশ ছিল না। তজ্জন্য মোল্লা বা পুরোহিত কিছুই লাগে নাই। গঙ্গাজল হরেনাম নামও দরকার হয় নাই। হরিনাম কীর্ত্তন হইয়াছিল। তাঁহারই উপদেশ অনুসারে আখড়ার মধ্যে একটি ঘরের ভেতর তাঁহার সমাধি হইয়াছে।"

এভাবেই মানবতার মহাপুরুষ ফকির লালন শাহ চলে গেলেন মর্তের এ পৃথিবী থেকে। আর বেঁচে রইলেন হাজার শিষ্য-পরম্পরা আর ভক্তজনের মাঝে।

ফকির লালন শাহের জীবন-কথা রচনায় আমরা চেষ্টা করেছি পূর্ববর্তী গবেষক ও জীবনীকারদের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বস্তুনিষ্ঠ তথ্যটি আবিষ্কার করতে। এক্ষেত্রে তথ্য-স্বল্পতা রয়েছে। আমরা যদি তাঁর গানগুলো সঠিকভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারি তবে তাঁর জীবনের অনেক তথ্যই হয়ত সেখান থেকে পাব। কারণ গানেই রয়েছে—লালনের ব্যক্তিত্ব, রুচিবোধ, মেজাজ, মনন, চিন্তা- চেতনা, সাধনার বীজমন্ত্র।

৮৯. উদ্ধৃত, লালন সাঁইয়ের সন্ধানে, পূর্বোক্ত পৃ. ২৮।

দ্বিতীয় অধ্যায়
লালন শাহের গানের প্রকৃতি, তত্ত্ব ও দর্শন

লালনের গানের একটি ভিন্নধর্মী প্রকৃতি বা স্বতন্ত্র স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ প্রসঙ্গে গবেষকদের মতামত থেকে প্রতীত হয় লালন—কবি, দার্শনিক, ধর্মবেত্তা, প্রেমিক ও সাধক কিংবা বাউল শিরোমণি সবই তাঁর গানকে আশ্রয় করেই নির্ণীত হয়েছে। সুতরাং তাঁর গানে যে স্বতন্ত্র সম্মোহনী শক্তি রয়েছে তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। এ বিষয়ে লালন-গবেষক উল্লেখ করেছেন "বাঙালাদেশের নানা অঞ্চল থেকে সংগৃহীত বাউল গানের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় ঐ সমস্ত গানের মধ্যে লালন-গীতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে চিহ্নিত। সহস্র সহস্র বাউল গানের মধ্যেও লালন সাঁইয়ের গানে ভণিতাযুক্ত কিংবা ভণিতাহীন, যে কোন রূপে নির্দেশ করা অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে কঠিন নয়। লালনের গানে রচনা-রীতি, ছন্দ, সুর, ভাব-মাধুর্য, শব্দ-প্রয়োগ নৈপুণ্য, মর্ত-মুখীনতা, সহজ মানবীয় অনুভূতি, উদারতা, গভীরতা, বিশালতা, পরিহাস-প্রিয়তা, রঙ্গ-ব্যঙ্গ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।"[১] লালনের গানে সুবিন্যস্ত যে বিন্যাস রয়েছে তা অন্যান্য বাউল গানে একেবারে বিরল।[২] অন্য একজন গবেষক এভাবে উল্লেখ করেছেন—"লালনবাণী এক সমৃদ্ধ পরম্পরা সৃষ্টি করেছে প্রধানত প্রকাশভঙ্গির স্পষ্টতা ও আত্মদর্শনের অনন্যভঙ্গিতে।"[৩]

গানগুলো তাঁর নিজস্ব গঠন শৈলীর নিপুণতায় অনন্য। শতাধিক বৎসর আয়ুধারী লালন জীবনের ভিন্ন ভিন্ন বাঁকে এ গানগুলো রচনা করেছেন। তাই গানগুলো বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যায় বাল্যজীবনের বিষয়, গুরু সান্নিধ্যের বিষয় এবং নিজে শিষ্য গ্রহণের বিষয়। সর্বোপরি পরিণত জীবনের নানাবিধ সমস্যা-সংকুল জীবন, যা সামগ্রিক জীবনের ক্যানভাসে যেন বিমূর্ত হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে অন্যান্য বাউল গায়ক বা কবির থেকে তিনি ভিন্ন ছিলেন। প্রথমত ভণিতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্যান্য বাউল গায়ক রচয়িতা থেকে তিনি স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন। নিজেকে মর্তের ধূলি-ধূসর পথে বিলিয়ে দিয়ে বেদ-বিধি-শাস্ত্র অগ্রাহ্য করে মানুষকে মহৎ করার মহান বাণী শোনাতেন। তিনি যে অতি সহজ-সরল অনাড়ম্বর ভাষা ব্যবহার করেছেন তা উল্লেখযোগ্য এজন্য যে, সে যুগের কোন কবি-গায়ক কিংবা বাউলদের রচনায় বিরল এমনকি তৎকালীন লেখ্য সাহিত্যেও বিশেষ করে ভাষা ব্যবহারে রামমোহন রায় কিংবা বিদ্যাসাগর থেকেও একেবারে সাধারণ এবং আটপৌরে জীবনের কথা অতি সাধারণ ভাষায় এনেছেন। সহজ-সরল ভাষায় শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তিনি তত্ত্বের গভীরে পৌঁছতেন, অন্যদিকে গভীর তত্ত্ব-কথাকে রঙ্গ-রসের আবরণে সহজেই পরিবেশন করতেন। শব্দ প্রয়োগে এরূপ অনন্য স্বাতন্ত্র্যের জন্য তাঁর প্রশংসা করতে হয়। লালনের অসংখ্য গানের মধ্যে এমন একটি শব্দও খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য যা যথাযথ এবং সুপ্রযুক্ত নয়। এমন একটি চরণও অনুপস্থিত যার বিন্যাস কোন প্রশ্ন উত্থাপন করে।[৪] তত্ত্ব-দর্শন ছাড়াও লালনের গানের ভিন্নতর স্বাদের জন্যও জ্ঞান-চর্চার নীরব তপস্বী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আজীবন উপনিষদ থেকে বাইবেল এবং লালনকে সঙ্গে রাখতেন।[৫]

---

১. এস. এম. লুৎফর রহমান, লালন-গীতি চয়ন, ঢাকা : ধারণী সাহিত্য সংঘ, ডিসেম্বর, ১৯৮৫, পৃ. (১৬)

২. পূর্বোক্ত, পৃ. (১৬)।

৩. জুলফিকার নিউটন, মরমী লালন ফকির, ঢাকা : ২০০৮, পৃ. ২৩।

৪. আবু জাফর, লালনগীতি, আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত লালনসমগ্র, ঢাকা : পাঠক সমাবেশ, জুলাই, ২০০৯ (পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ৯৬৪

৫. সৈয়দ আকরাম হোসেন, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ, কলিকাতা, ২০১১, পৃ. ১৩।

এছাড়াও লালনের গানে আরেক ভিন্ন রীতি পরিলক্ষিত হয়, তা হচ্ছে 'জোড়াবাঁধা' গানের রীতি। একটি গানে যেমন রহস্য-কথা থাকে; তার পরবর্তী গানে এ রহস্যের স্বরূপ উন্মোচনের জন্য তেমনি অন্য একটি গান থাকে। অর্থাৎ প্রশ্নোত্তরমূলক পদ্ধতিতে এ গানগুলো পরিবেশিত হয়।[৬] অবশ্য চর্যাপদ থেকে এ রীতি বহাল থাকলেও ফকির লালনের গানে যেন প্রাণ পেয়েছে। নিম্নোক্ত দু'টি গান—

প্রশ্ন— "বল্‌রে বলাই তোদের ধরন কেমন হারে
তোরা ঈশ্বর বলিস যারে
স্কন্ধে চড়িস তার-কোন বিচারে॥
আমারে বুঝাওরে বলাই
তোদের দেখি কোন জ্ঞান নাই।
বলিস সব রাখাল
ঈশ্বর গোপাল
তবে মারিস কেন রে ॥
বনের যত বনফল খাও
এঁটো ক'রে গোপালকে দাও
বল তার মর্ম
সে কেমন ধর্ম
আজ আমারে ॥
গোষ্ঠে গোপাল যে দুঃখ পায়
কেঁদে কেঁদে আমারে কয়
লালন কয় যার
ভাব বুঝা ভার
এ সংসারে ॥"[৭]

উত্তর— "ও মা যশোদা গো
তাই আর ব'ল্লে কি হবে।
গোপালের এঁটো দি মা
সবে যে ভাল ভেবে ॥
মিঠের লোভে এঁটো দি মা
পাপ-পুণ্যের জ্ঞান থাকে না
গোপাল খেলে পাই-সান্ত্বনা
পাপ-পুণ্য কে ভাবে ॥
স্কন্ধে চড়াই স্কন্ধে চড়ি
যে ভাব ধরায় সেই ভাব ধরি
এ সকল বাসনা তারি
বুঝি ছিল গো পূর্বে ॥
গোপালের সঙ্গে যে ভাব
ব'লতে আকুল হই মা তা'সব
লালন বলে পাপ-পুণ্যের লাভ
ভুল হয় গোপালকে সেবে ॥"[৮]

---

৬. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, বাউল কবি লালন ও তাঁর গান, ঢাকা : শিখা প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ৩০
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২।
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩।

বিশ্লেষণ করলে লালনের গানে এ ধরনের আরও অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। লালনের গানের প্রকৃতি কখনো কখনো একান্ত কথোপকথনমূলক এবং সময় বিশেষে নাটকীয় বটে। তিনি নিজেই নিজেকে সম্বোধন করে বলছেন—

'পাবে সামান্যে কি তার দেখা'

অথবা- 'এই মানবজনম আর কি হবে' ইত্যাদি।[৯]

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ভণিতা ব্যবহারের ক্ষেত্রের লালন অন্যান্য বাউল কবির চেয়ে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন। একাধিক বৈচিত্র্যময় ভণিতার প্রয়োগ তাঁর গানকে যেমন মর্মস্পর্শী করেছে তেমনি জীবনকে যে তিনি বিভিন্ন পর্যায়ে উপলব্ধি করেছেন তারও প্রত্যয় রয়েছে। 'লালন' শব্দটির আগে কিংবা পরে অধীন, অবোধ, ভেঁড়ো, মূঢ় ইত্যাদি বিশেষণ এবং ফকির, দরবেশ, সাঁই প্রভৃতি উপাধিমূলক বিশেষ্য ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও গানের ভণিতায় শ্রদ্ধাভরে তাঁর দীক্ষা গুরুর সিরাজ সাঁইয়ের উল্লেখ রয়েছে, উল্লেখিত হয়েছে শিষ্য কিনুর নামও। এরূপ উল্লেখযোগ্য ভণিতা যেমন—

ক. লালন বলে কে দেয় খেয়া/ চিনলে না তারে।[১০]

খ. অধীন লালন বলে কৃষ্ণ / লীলার অন্ত নাই।[১১]

গ. পাগলের নামটি কেমন / বলিতে অধীন লালন/ হয় তরাসে।[১২]

ঘ. সিরাজ সাঁই কয়, লালন রে তোর/ মূল হারালি কোলের ঘোরে।[১৩]

ঙ. ফকীর লালন বলে রসুলেরে/ না চিনি পড়েছি ফ্যারে।[১৪]

চ. লালন ফকির পড়ল ফাঁকে/ মনের দ্বিধায়।[১৫]

ছ. বলে মূঢ় লালন ভবে এসে মন/ কি করিতে না জানি কি করে যাই।[১৬]

জ. সাঁই লালন বলে, ভাবুক হলে/ ধাক্কা লাগে তাহারি গায়।[১৭]

ঝ. দরবেশ লালন বলে, তাই কার আগমন/ সেই যোগের সনে।[১৮]

ঞ. লালন ভেঁড়ো না বুঝিয়ে/ হয় দোটানা।[১৯]

ঠ. তাই লালন দরবেশ বলে কিনু রে বাপ আয় সকালে/ এই মানব জনম যায় গো বিফলে/ বৈসে বা কি করো।[২০]

লালন জীবনের প্রথম পর্বে কেবল লালন নামে ভণিতা ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ গুরু সিরাজ সাঁইয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণের সময় নিজের নামের সঙ্গে গুরুর নাম উল্লেখ করেছেন। তৃতীয় পর্ব যেখানে তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধি লাভের পর নিজের নামের সাথে ফকির, দরবেশ, সাঁই ব্যবহার করেছেন।[২১]

---

৯. মুচকুন্দে দুবে, লালন ফকির সাধনা, লালনসমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫০।
১০. লালন-গীতি চয়ন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২
১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬,
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১.
১৩. ওয়াকিল আহমদ, লালন গীতি সমগ্র, ঢাকা : বইপত্র, ২য় প্রকাশ, ২০০৫, পৃ. ৫৫.
১৪. লালন-গীতি চয়ন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩
১৫. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫.
১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬
১৭. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫
১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫
১৯. লালন-গীতি চয়ন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯
২০. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫.
২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫.

এছাড়াও রচনা-রীতিতে একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র ঘরানা তৈরি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে লালন-গবেষক মুহম্মদ আবূ তালিবের বক্তব্য—

'শুধু ভাষার দিক দিয়ে কেন, কি ব্যক্তি-অনুভূতি, কি রাগ- বৈদগ্ধ্যের দিক দিয়ে লালনের গানে এমন এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে একবার শুনলে বা এক নজর দেখলেই তাকে চেনা যায়।'[২২]

গানের সুরের ব্যাপারে তাঁর মন্তব্য থেকে আরও প্রতীত হয় যে, আমাদের আধুনিক সংগীত শাস্ত্রে যেমন রাবীন্দ্রিক সুর ও সংগীতরীতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে তেমনি লালনশাহী সুর ও সংগীত রীতি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বিশেষত্ব ব্যঞ্জক।[২৩]

লালন সমসাময়িক কালে অনেকে বাউল গান রচনায় ব্রতী হন। এঁদের মধ্যে পাগলা কানাই (১৮২৪-১৮৮৯), পাঞ্জু শাহ (১৮৮১-১৯১৪), ইন্দু বিশ্বাস, নয়ন ফকির প্রমুখ। পাগলা কানাই মূলত জারি গানে বড় মাপের শিল্পী ছিলেন। সে সময় বয়াতী হিসেবে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি ছিল। অপর দিকে পাঞ্জুশাহ রচয়িতা হিসেবে যথেষ্ট দক্ষ হলেও লালন শাহের মত প্রগতিশীল পরিবেশনা তাঁর গানে অনুপস্থিত, তিনি অনেকটা শরিয়তপন্থী এবং মধ্যযুগের পুঁথি সাহিত্যের বড় ছাপ তাঁর গানে রয়েছে। অন্যদিকে ইন্দু বিশ্বাস ধুয়া গানের বড় শিল্পী হলেও শেষ পর্যন্ত পাগলা কানাইয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন।[২৪]

এছাড়া বাউল হাউড়ে, গোসাই, জহর শা, উজল শা, যাদুবিন্দু প্রভৃতির রচনায় লালন শাহের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে।[২৫] ঈশ্বরগুপ্ত, বিহারীলাল, কাঙাল হরিনাথ, মীর মশাররফ হোসেন লালন কালের শিক্ষিত কবি। স্বভাবকবি লালন তাঁর গানের স্বভাব সুলভ অনন্যতায় এক কালোত্তীর্ণ যুগের সৃষ্টি করেছেন।

দেশজ-লোকোজ সুরের ঘ্রাণে বৈষ্ণব, সুফি, বাউল ভাবধারার দ্রবণে দ্রবীভূত হয়ে লালনের গান স্বকীয়তায় ভাস্বর। এছাড়াও আঙ্গিকগত দিক থেকে লালনের গান রূপক-উপমায় এবং ব্যঞ্জনায় স্বতন্ত্ররূপ পেয়েছে।[২৬]

তত্ত্ব-সাধক লালন তাঁর গানে নানাবিধ তত্ত্বের সমাহার ঘটিয়েছেন। কেননা বাউল গান তত্ত্বভিত্তিক গান; বাউলের জীবনাচারে-ধর্মে-বিশ্বাসে-আরাধনায় তত্ত্বকথা যেমন চর্চিত হয় তেমনি ব্যক্তিজীবনে তা পালনের তাগিদ অনুভব করেই একটি সমন্বিত প্রয়াস চলে। নানা ধর্মের স্রোতধারার সম্মিলনে বাউল গানে একটি বিশেষ ধর্মতত্ত্বের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় আরও নানাবিধ তত্ত্ব।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' নামক গ্রন্থে যে ৫১৭টি গান সংকলিত করেন বিভিন্ন পদকর্তার নামানুসারে এর মধ্যে ১৬০টি গান লালন শাহের। এ গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বাউল গানগুলোকে বিশ্লেণ করে পাঁচটি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বিস্তৃত ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। উপাদান পাঁচটি—১. বেদ-বহির্ভূত ধর্ম, ২. গুরুপদ, ৩. স্থূল মানবদেহের গৌরবঃভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডবাদ, ৪. মনের মানুষ, ৫. রূপ-স্বরূপতত্ত্ব।[২৭] এবিভাজনে মূলত লালনের গানের অন্তর্নিহিত তত্ত্বকে অবলম্বন করে শ্রেণিবিভাজনের অবতারণা করলেও এ বিভাজন বস্তুত কোন ভাব বা বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে এমনকি অক্ষরানুক্রমিকভাবেও বিভাজিত হয়নি।

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ও মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত হারামণি ৫ম খণ্ডে লালন-গীতিতে ২২৫টি লালনের গান এবং কানাই-গীতি অংশে ১০০টি পাগলা কানাইয়ের গানসহ মোট ৩২৫টি গানের সংকলনে লালনের গানগুলোকে এরূপ বিভাজন করেছেন—১. হামদ-নাত, ২. আত্মতত্ত্ব, ৩. মন, ৪. মনের মানুষ, ৫. গুরুতত্ত্ব, ৬. প্রেম, ৭. ভাব, ৮. সাধন, ৯. সাধন ধাঁধা, ১০. দমের জাহাজ : দেহ

২২. মুহম্মদ আবূ তালিব, লালন শাহ ও লালন-গীতিকা, ১ম খণ্ড, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮, পৃ. ২০৯
২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৯.
২৪. ডক্টর আনোয়ারুল করিম, বাংলাদেশের বাউল, ঢাকা : ২০০২, পৃ. ৪৪৬-৪৪৭.
২৫. এস, এম. লুৎফর রহমান, লালন-অনুসারী কবিবৃন্দ, মোহাম্মদ মনিরুজ্জান সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, উনবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কার্তিক, ১২৯২, পৃ. ২১।
২৬. সুব্রত রুদ্র, লালনের গৌরগান, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১৮।
২৭. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল ও বাউল গান, কলিকাতা : দীপান্বিতা, ১৩৬৪, পৃ. ২৯১-৩৬৮।

সাধন, ১১. মুরশিদী, ১২. মারফতী, ১৩. খোদাপ্রেম, ১৪. ইসলামী : মারফতী, ১৫. খোদাতত্ত্ব, ১৬. ইসলামী : নবী, ১৭. সেজদা, ১৮. নামতত্ত্ব, ১৯. সৃষ্টিতত্ত্ব, ২০. বৈষ্ণবভাবাপন্ন, ২১. কৃষ্ণপ্রেম, ২২. বিরহ, ২৩. বিবিধ : কলিকাল, সূক্ষ্মধর্ম, মর্ত্য, জীবন।[২৮]

উল্লেখিত শ্রেণিবিভাজনে বিশেষ কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে করা হয়নি। বরং দেখা যায়, বৈষ্ণবভাবাপন্ন, কৃষ্ণপ্রেম ও বিরহ এ বিভাজনে একটি পর্ব সহজেই আর একটি পর্বকে অধিক্রমণ করে যায়। কাজেই এখানে শৃঙ্খলার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

মতিলাল দাশ ও পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত বৃহৎ সংকলন 'লালন গীতিকা' গ্রন্থেও লালনের গানগুলো কোন সুনির্দিষ্ট রীতি অনুসারে বিভাজিত হয়নি। সনৎকুমার মিত্রের 'লালন ফকির : কবি ও কাব্য' গ্রন্থেও গানগুলোকে যুক্তিনিষ্ঠ উপায়ে বিভাজন করা হয়নি।[২৯]

কবি জসীমউদ্‌দীন 'বাউল' শীর্ষক গ্রন্থে লালনের গানকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন—১. আত্মতত্ত্ব, ২. গুরুতত্ত্ব, ৩. মনের মানুষ, ৪. নৃতত্ত্ব।[৩০] এগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও তিনি করেছেন। তবে তাঁর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে 'নৃতত্ত্ব' বিষয় নতুন শব্দ লালনের তত্ত্বে পাওয়া গেলেও আরও অনেক তত্ত্বের সমন্বয়ে যে লালনের গানগুলো বিভাজিত সে বিষয়ে উল্লেখ নেই। অধ্যাপক আবূ তালিবের লালন-গীতি বিভাজন এরূপ : ক. প্রথম পর্যায়—১. হামদ-নাত, ২. মুরশিদতত্ত্ব, ৩. আত্মতত্ত্ব, ৪. দেহতত্ত্ব ও পরমতত্ত্ব। দ্বিতীয় পর্যায়—১. শ্রীরাধার লীলাতত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য লীলা তত্ত্ব। এবং তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে জিজ্ঞাসা।[৩১]

খোন্দকার রফিউদ্দিন 'ভাব-সঙ্গীত'[৩২] গ্রন্থে লালনের পদগুলোকে সূচীপত্রে উল্লেখ অনুযায়ী নিম্নোক্ত ভাগে বিভক্ত করেছেন—১. দৈন্য, ২. নবীপদ, ৩. প্রদত্ত, ৪. রাগ। বস্তুত এরূপ সামান্য কয়েকটি তত্ত্বের মধ্য দিয়ে লালনের গানকে বিশ্লেষণ করা দুরূহ।

খোন্দকার রিয়াজুল হক সংকলিত ও সম্পাদিত 'লালন সংগীত চয়ন' (১৯৮৯) গ্রন্থে ২৫৭টি গান বিষয়-ভিত্তিক নমুনাসহ উল্লেখ করেছেন এবং এগুলো ব্যাখাসহ বিভাজন করেছেন। বিভাজনগুলো এরূপ—১. আল্লাহতত্ত্ব, ২. রাছুলতত্ত্ব, ৩. সৃষ্টিতত্ত্ব, ৪. মুরশিদ তত্ত্ব, ৫. গুরুতত্ত্ব, ৬. পঞ্চবেনাতত্ত্ব, ৭. মানুষতত্ত্ব, ৮. মনতত্ত্ব, ৯. আত্মতত্ত্ব, ১০. মনের মানুষ তত্ত্ব, ১১. জাতিতত্ত্ব, ১২. দেহতত্ত্ব, ১৩. করণতত্ত্ব, ১৪. চাঁদতত্ত্ব, ১৫. রূপতত্ত্ব, ১৬. প্রেমতত্ত্ব, ১৭. লীলাতত্ত্ব, ১৮. গৌরতত্ত্ব, ১৯. পারাপার তত্ত্ব, ২০. গোষ্ঠতত্ত্ব, ২১. বিবিধতত্ত্ব।[৩৩] এখানে এক তত্ত্বের সঙ্গে অন্য তত্ত্বের সংহতি ঘটেছে। যেমন, দেহতত্ত্বে চাঁদতত্ত্ব আলোচনা চলে। কাজেই বাড়তি চাঁদতত্ত্বের প্রয়োজন পড়ে না।

এস. এম. লুৎফর রহমান তাঁর 'লালন-গীতি চয়ন' গ্রন্থে এভাবে বিভাজন করেছেন—১. নাম, ২. কুল, ৩. জাতি, ৪. সমাজ, ৫. সংস্কার, ৬. শাস্ত্র, ৭. ধর্ম, ৮. ফকিরী, ৯. তরিকা, ১০. নবী-মহিমা, ১১. নমাজ, ১২. কৃষ্ণলীলা, ১৩. চৈতন্য-লীলা, ১৪. গুরু মহিমা।[৩৪] কিন্তু এখানে 'কুল' ও 'জাতি' পর্ব দুটির মধ্যে ভিন্নতা সামান্য এমনিভাবে 'সমাজ' ও 'সংস্কার'। বিধায় এখানে শৃঙ্খলতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

অন্যদিকে লালন ঘরানার ফকির আনোয়ার হোসেন মন্টু শাহের লালন-সংগীত তিন খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থের ১ম খণ্ডে তত্ত্বের বিভাজন এরূপ—১. নবুয়ত তত্ত্ব, ২. নামাজের তত্ত্ব, ৩. বিলায়েত

---

২৮. মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ও আবদুল হাই সম্পাদিত হারামণি পঞ্চমখণ্ড, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪, ২য় সংস্করণ, পৃ. ১-১২৭।

২৯. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮।

৩০. কবি জসীমউদ্‌দীন, বাউল, ঢাকা : ঢাকা বইমেলা, ১৯৯৯, পৃ. ৪৯-৫৫।

৩১. মুহম্মদ আবূ তালিব, লালন শাহ ও লালন-গীতিকা ১ম খণ্ড, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮, পৃ ২২৭।

৩২. খোন্দকার রফিউদ্দিন, ভাবসঙ্গীত, ঢাকা : ডিসেন্ট আর্ট প্রিন্টার্স, ১৩৭৪ বাংলা, ২য় সংস্করণ, সূচিপত্র, পৃ. ১-১৪

৩৩. মোমেন চৌধুরী, লালন বিষয়ক রচনাপঞ্জি, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, পৃ. ২৯-৩০।

৩৪. লালন-গীতি চয়ন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১-২০৮.

তত্ত্ব, ৪. দন্যতত্ত্ব, ৫. চাঁদ তত্ত্ব, ৬. ত্রিপেনী তত্ত্ব, ৭. সৃষ্টিতত্ত্ব, ৮. গুরুতত্ত্ব, ৯. মুর্শিদ তত্ত্ব, ১০. প্রবর্ত তত্ত্ব, ১১. রাগ প্রবর্ত, ১২. ঘরের তত্ত্ব, ১৩. কৃষ্ণলীলা ও বিচ্ছেদ, ১৪. গৌরলীলা ও গোষ্ঠ।[৩৫]

এখানে লালনের উল্লেখযোগ গানের মধ্যে দেহতত্ত্বের উল্লেখ নেই যদি ঘরের তত্ত্বে কিছু আভাস পাওয়া যায় তারপরেও দেহতত্ত্ব বাউল তথা লালনের গানের প্রধানতম তত্ত্বের বিষয়বস্তু। তবে এক্ষেত্রে অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদের বিভাজনটি প্রায় বাউল লালনের গানের সকল তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করতে পেরেছে বলে বিশ্বাস হয়, কেননা লালনের গানের সংকলিত-সম্পাদিত গ্রন্থ 'লালন গীতি সমগ্র' সম্পর্কে লালন-গবেষক আবুল আহসান চৌধুরী যথার্থই উল্লেখ করেছেন—"ওয়াকিল আহমদ সংকলিত-সম্পাদিত 'লালন গীতি সমগ্র' (১৪০৯) বইটিকে ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। দীর্ঘ ভূমিকা, গানের শ্রেণীকরণ, গান-সংগ্রহের সূত্র উল্লেখ ও পাঠান্তর-নির্দেশ লালনের গানের অন্যতম সকল সংকলন থেকে এই বইকে পৃথক ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে।"[৩৬] ওয়াকিল আহমদ বাউল তথা লালনের গান কিভাবে পরস্পর সমন্বিত হয়ে অগ্রসর হয়, সে সম্বন্ধে একটি তত্ত্ব-চক্রও নির্মাণ করেছেন। এটি তিনি লালনের গানে সাধন-চক্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন : নিম্নে চক্রটি প্রদত্ত হলো :

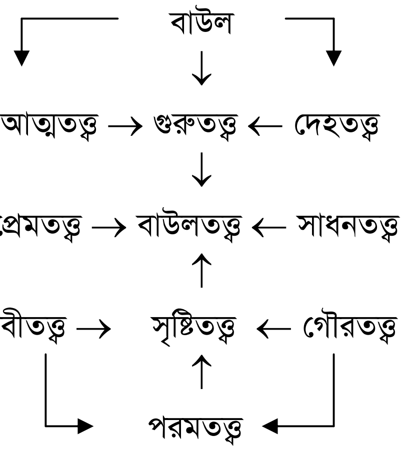

মূলত ভাব বা তত্ত্বকে কেন্দ্র করে এ সাধন-চক্রটি নির্মিত হয়েছে। তবে এখানে প্রধানত সাতটি তত্ত্ব লালন-সংগীতকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। বাউল গানের তত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় তিনি তাঁর বহুল আলোচিত 'বাউল গান' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সৃষ্টিতত্ত্বে তিনি দুটি ধারা নবিতত্ত্ব ও গৌরতত্ত্ব দেখিয়েছেন ছকে। এছাড়াও সমাজ-কালের ভাবনাস্নাত ও অন্যান বিষয় সেগুলোকে বিবিধ নামে আরেকটি শাখা নির্মাণ করে দিয়েছেন। তত্ত্বের এরূপ শ্রেণিকরণে তিনি নিশংসয়ে উল্লেখ করেছেন, 'বাউল গানের ভাব বা তত্ত্বের এরূপ শ্রেণীকরণ দৃঢ়কক্ষবদ্ধ নয়, অনেক গানে এক ভাবের সাথে অন্য ভাবের মিশ্রণ আছে।'[৩৭] তারপরেও আমরা প্রধানতম সাতটি তত্ত্ব নিয়ে তত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা করতে চাই—

আত্মতত্ত্ব

আত্ম-অন্বেষণে প্রত্যয়শীল লালনের গানে মূর্ত হয়ে উঠেছে আত্মতত্ত্ব কথা—

---

৩৫. ফকির আনোয়ার হোসেন মন্টু শাহ সম্পাদিত লালন-সঙ্গীত, প্রথম খণ্ড, কুষ্টিয়া, ২০১১, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ৮৫-৩৮৪।

৩৬. লালনসমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭.

৩৭. ওয়াকিল আহমদ, বাউল গান, ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, মার্চ ২০০০, পৃ. ৪৮।

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি
কেমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মন-বেড়ি
দিতাম তার পায়॥
আটকুঠরি নয় দরজা
মধ্যে মধ্যে ঝরকা কাটা
তার উপরে সদর কোঠা
আয়না মহল তায় ॥[৩৮]

আত্মা ও পরমাত্মার তত্ত্ব সুফি মতবাদে ও বৈষ্ণব মতে প্রচলিত। বাউলেরা তাই আত্মা ও পরমাত্মার বিভেদ তো নয়ই বরং অদ্বৈত কল্পনা করে থাকেন। বাউল লালনের গানে এভাবে ধ্বনিত হয়েছে—

আপনার আপন চিনেছে যে জন,
দেখতে পাবে সেই রূপের কিরণ
সেই আপন আপন রূপ, সেবা কোন স্বরূপ
স্বরূপেরও সেই রূপ জানিও কারণ।...
আত্মা দিয়া আত্মার করে রে ভজন ॥[৩৯]

দার্শনিক সক্রেটিস যেমন বলেছেন, 'Knoweth thyself '—নিজেকে চেন, ইসলাম ধর্মে বলা হয়েছে 'মান আরাফা নাফছাহু ফাকাদ আরাফা রব্বাহু' যে নিজেকে চিনিছে সে তার প্রভুকে চিনেছে। আবার বেদে আছে 'আত্মানং বিদ্ধি'। এসব তত্ত্বের স্পষ্ট সম্মিলন যেন লালনের গানে উচ্চারিত হয়েছে—

আত্মতত্ত্ব যে জেনেছে
দিব্যজ্ঞানী সেই হয়েছে।

আত্মতত্ত্বের প্রদীপ জ্বেলেই লালন নিজেকে যেন খুঁজে ফিরে 'চৌদ্দ পোয়া' এই দেহে, কিংবা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অপার মিলনের বাসনায় সীমাবদ্ধ আত্মতত্ত্ব জ্ঞানে নিজের মাঝে নিজেকে আবিষ্কার করা আরেক বিস্ময়ের কাজ। তাই ফকির লালন বলেন—

আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে।
তারে জনমভর একবারে দেখলাম না রে।[৪০]

ফকির লালন তাঁর সাধন-জীবনের নানা দ্বন্দ্ব-বিবাদ-বিভেদ অতিক্রম করে পরম আরাধ্যকে ধরতে চান, তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে চান। মিলন ব্যাকুলতায় তাঁর হৃদয়তন্ত্রীতে বান ডেকে ওঠে—

আমার মনের মানুষের সনে,
মিলন হবে কত দিনে ॥[৪১]

দেহতত্ত্ব

বাউল গানের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে সাধনঘটিত ক্রিয়াকর্মের রূপকের ছলে বর্ণনা যা একান্ত দেহকে কেন্দ্র করে বিবৃত হয়েছে। অধ্যাত্মসাধনায় স্রষ্টা কিংবা পরমপুরুষ কিংবা পরমাত্মাকে

---

৩৮. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, লালন শাহ ও আত্মদর্শন, লালনসমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯৩।
৩৯. বাউল গান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২।
৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১
৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২।

অনুসন্ধান করে তার সঙ্গে মিলিত হবার প্রবল যে কামনা ব্যক্ত হয়েছে তার মূল ক্ষেত্র হচ্ছে দেহ এবং দেহজ বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়জ সম্পর্ক সেতু নির্মাণ করে ইন্দ্রিয়াতীত জগতে উপনীত হতে চান।[৪২] দেহ-মন-আত্মার সম্মিলনে নশ্বর দেহকে অবিনশ্বর করে উপলব্ধি করেছেন লালন... 'এমন মানব-জমিন রইল পতিত চাষ করলে ফলতো সোনা' কিংবা তিনি দেহ খাঁচায় পাখির আসা- যাওয়াকে যেমন রূপকাশ্রয়ে আকর্ষণীয় করেছেন তেমনি দেহের মধ্যে প্রতিনিয়ত উড়ে আসা এ পাখির প্রতি মোহ ও আসক্তি ত্যাগের ব্যাপারেও পরামর্শ দিয়েছেন—

মন তুই রইলি খাঁচার আশে
খাঁচা যে তোর তৈরি কাঁচা বাঁশে
কোন দিন খাঁচা পড়বে খসে।[৪৩]

তারপরেও লালন দেহের মধ্যে সেই পরমপুরুষকে বন্দী করার জন্য 'মনো-বেড়ি' লাগাতে চেয়েছেন। দেহের মধ্যে 'ঈড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না' এর ত্রিসঙ্গমস্থলে 'মীন' রূপে পরমপুরুষ বিরাজ করে। বিশেষ বিশেষ সময় ও অবস্থায় 'তার' আবির্ভাব ঘটে। লালন ফকির বলেন—

সময় বুঝে কেন বান্দাল বাঁধলে না
হা রে, জল শুকালে মীন পালাবে, পস্তাবে মনা ॥
ত্রিপিনির তীর-ধারে
মীন রূপে সাঁই বিহার করে
তুমি উপর উপর বেড়াও ঘুরে
মীন রূপের খেলা দেখলে না।

আবার, বাউলদের গানে দেহ সাধনতত্ত্বে অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে পূর্ণচন্দ্রের উদয়ের কথা ব্যক্ত হয়েছে। মানব দেহে অমাবস্যা 'কাম' আর পূর্ণিমা 'প্রেমে'র প্রতীক হিসেবে এসেছে। বস্তুত অমাবস্যা ও পূর্ণিমার মিলনের সময় ত্রিবেণীতে বসলে অধর মানুষ বা পরমাত্মাকে চেনা যায়, কারণ সময়ের এ দুর্লভ ক্ষণে তিনি অটল রূপে বিরাজ করেন। তাই ভাবুক লালন দেহ-ঘরে সন্ধানরত—

অমাবস্যায় চন্দ্র উদয়,
দেখতে যার বাসনা হৃদয়,
লালন বলে, থেকো সদায়
ত্রিবেণীতে থেকো বসে।[৪৪]

যে জ্যোতির্ময় প্রেম বাউলদের আরাধনা কামই তার প্রধান অনুসঙ্গ। সুতরাং কামকলার যথার্থ সময়ের অপেক্ষায় তা অর্জন করতে হবে। লালনের পরামর্শ তাই—'শুদ্ধ প্রেম সাধলে যদি কাম-রতিকে রাখলে কোথা।'[৪৫] দেহ বিশ্লেষণে লালন দেহ-বাগান উল্লেখ করেছেন। যেখানে আছে অজস্র ফুটন্ত ফুল আর তার সৌরভে জগৎ মাতোয়ারা। তাই ভাবরসিক লালন গেয়েছেন—

দেহের মধ্যে বাগান আছে,
নানা জাতির ফুল ফুটেছে,
ফুলের সৌরভে জগৎ মেতেছে
কেবল লালনের প্রাণ মাত্‌লা না।[৪৬]

এছাড়া দেহঘরে অজস্র সম্পদের পাহাড় আছে। সুতরাং লালনের মনোবিকারও কম নয়—'আমার ঘরের চাবি পরের হাতে'। তারপরেও দেহঘরে প্রতিনিয়ত 'অধর মানুষ' 'হাওয়া' রূপে

৪২. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা : প্রতিভাস সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃ. ১৬১.
৪৩. সুধীর চক্রবতী সম্পাদিত, বাংলা দেহতত্ত্বের গান, কলকাতা : পুস্তক বিপণী, ২০০০, পৃ. ১৯,
৪৪. মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬১।
৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২।
৪৬. বাউল গান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯।

আসে যায়। এই হাওয়ার গতি, স্থিতি এবং উৎপত্তি সম্বন্ধে ভক্তের উপলব্ধির জগতকে উর্বর করতে হয়। লালন স্পষ্ট উচ্চারণ করেছেন—'হাওয়ারূপে এই দেহে আল্লা আসে, আল্লা যায়'।[৪৭] সুতরাং মানবদেহ 'কল্প-ভূমি যত্ন করলে রত্ন ফলে'। লালনের দেহতত্ত্বের গানে তন্ত্রের যোগ-সাধনা এসেছে সেই সঙ্গে বৌদ্ধ-নাথ-সুফি যোগ সাধনাও একাকার হয়ে বিচিত্র পরিভাষায় পরিগ্রহ করেছে। দেহতত্ত্বের জটিলাবর্ত বিষয়কে উপলব্ধি করতে লালনের পরামর্শ- 'ধররে অধর চাঁদেরে অধরে অধর দিয়ে'। আর এখানেই গুরুর প্রয়োজন সর্বাগ্রে। বাউল অনুসারী কিংবা লালন ভক্তদের দাবী পৃথিবীর কোন প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। একমাত্র 'সিনার বিদ্যাই (অর্থাৎ বক্ষদেশের বিদ্যা) যথেষ্ট। আর এ জন্যই গুরু-মুর্শিদ কিংবা পীরকে ধরতে হবে, 'বায়াৎ' গ্রহণ করতে হবে। দেহের ভেদ জানতে হবে।

গুরুতত্ত্ব

বাউল গুরুবাদী লৌকিক ধর্ম যেখানে গুরুর কাছে দীক্ষাগ্রহণ ও নির্দেশিত পথেই সাধন-ভজন করে অগ্রসর হতে হয়; বাউলদের কাছে গুরু তাই পরম প্রাপ্তির বিষয়; সার্বভৌম শক্তির আধার। গুরু তাই 'যিনি মুরশিদ তিনি মওলা' কিংবা 'গুরু তুমি পতিতপাবন পরম ঈশ্বর'। গুরু সিদ্ধপুরুষ তাঁর ভজনার মধ্য দিয়ে মওলা কিংবা ঈশ্বরকে পাওয়া সম্ভব। কেননা গুরু ছাড়া 'আরশিনগরের পড়শী'কে চেনা যায় না, 'খাচার ভিতর অচিন পাখী'কে ধরা যায় না; 'আট কুঠুরী নয় দরজা'র হদিস পাওয়া যায় না, 'ত্রিবেণীর পিছল ঘাটে'র খবর আসে না; 'জ্যান্তে-মরা'র রহস্য উদ্ঘাটিত হয় না; 'মহাজনের ধন এনে', ছড়ানো হয় তা উলুবনে; 'দ্বি-দলের মৃণালে' 'সোনার মানুষ' সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় না; 'ঢাকা দিল্লী' হাতড়েও কোন ফল পাওয়া যায় না।

এরূপ নানাবিধ সমস্যা জর্জরিত এ পার্থিব জীবনে গুরুর কাছ থেকে পথ চিনিয়ে নিতে হয়; আর জটিল সাধনচক্রকে বুঝিয়ে দিয়ে তিলে তিলে গুরু গড়ে তোলে শিষ্যের অন্তরে ভক্তির দুর্ভেদ্য প্রাচীর। শিষ্যের দৃষ্টিতে গুরু ছাড়া দ্বিতীয় নেই, গুরু নির্ধারিত 'বর্জখ'কেই শিষ্য ত্রিভুবন পরখ করে। তাই সাধক লালন গুরু-শিষ্যের এরূপ সম্পর্ক উপলব্ধি করে বলেন—

গুরু, তুমি তন্ত্রের তন্ত্রী
গুরু, তুমি মন্ত্রের মন্ত্রী
গুরু, তুমি যন্ত্রের যন্ত্রী
না বাজাও বাজবে কেনে ॥[৪৮]

আবার বাউল সাধনতত্ত্বে অভক্ত-অজ্ঞ জনারে সাধনতত্ত্বের গুহ্যভেদ বলা নিষেধ করা হয়েছে। কাজেই উপযুক্ত গুরুর কাছে শিষ্যত্ব বরণ করতেই হবে। তার কারণ যার গুরু নেই, সে তো শয়তানের চেলা। এ বিষয়ে লালনের স্পষ্ট উচ্চারণ—

বে-মুরিদেরা ত
শয়তানের অনুগত
এবাদৎ বন্দেগী তার তো
সই দেবে না দয়াময়।[৪৯]

এক সময় ভক্ত গুরুকে উপলব্ধি করতে পারে, জীবনের সমস্ত হিসাব-নিকাশ শেষ করে তাঁর সম্বন্ধে সে যখন জানতে পারে, তখনই বিনম্রচিত্তে গুরুর চরণদাসীর জন্য প্রার্থনা জানায়। লালন ফকির বলেন—

আমারে কি রাখবেন গুরু চরণদাসী?
ইতরপনা কার্য আমার অহর্নিশি ॥

---

৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২।
৪৮. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০.
৪৯. পূর্বোক্ত পৃ. ২১২

জঠর যন্ত্রণা পেয়ে
এলাম যে করার দিয়ে
রইলাম তা সব ভুলিয়ে
ভবে আসি ॥
চিনলাম না সে গুরু কি ধন
জানলাম না তার সেবা সাধন
ঘুরতে বুঝি হল রে মন
চৌরাশি ॥[৫০]

শুধু শিষ্যের প্রয়োজন গুরুকে নয় বরং উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্যের যে মণি-কাঞ্চন যোগ হয় তাতেই ত্রিভুবনের রূপ-স্বরূপ পরিলক্ষিত হয়। গুরু-শিষ্যের এ মিলনের চিত্রটি এভাবেই লালন উল্লেখ করেছেন—

গুরু-শিষ্য এমনই ধারা
চাঁদের কোলে থাকে তারা
আয়নাতে লাগায়ে পারা
দেখে ত্রিভুবন।[৫১]

গুরু-শিষ্যের একাত্মতা থেকে পরম আরাধ্যকে পাওয়া যায়। বাউল-ধর্মের রীতি অনুযায়ী তিন মনের সম্মিলন; আত্মা-পরমাত্মার মিলনে গুরু অনুঘটক (catalyst) হিসেবে ভূমিকা রাখে।[৫২]

গুরুতত্ত্বে লালনের গানে সুফিতত্ত্বের প্রতিধ্বনি থেকে 'গুরু' সম্বন্ধে ধারণা আরও স্পষ্ট হয়েছে এভাবে—

মুরশিদ বিনে কি ধন আর আছে রে জগতে ॥
মুরশিদের চরণ সুধা
পান করিলে হরে ক্ষুধা।
করো না দেলে দ্বিধা
যেহি মুরশিদ সেহি খোদা।
বোঝ 'অলিয়ম মোরশেদা' আয়ত লেখা কোরানেতে ॥[৫৩]

এ ছাড়া গুরু অমৃত তুল্য, 'গুরু' নামক সুধা বস্তুটি পান করলে সত্যি জীবের কোন ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকে না। তাই গুরু নমস্য, গুরুই সাধনার মূল। লালন ফকির বলেন—

গুরুর নাম সুধা-সিন্ধু
পান কর তাতে একবিন্দু
সখা হবে দিনবন্ধু
অন্য ক্ষুধা রবে না রে ॥[৫৪]

অর্থাৎ গুরুর কাছে নিরঙ্কুশভাবে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে শিষ্যের শিষ্যত্ব পূর্ণ হয়[৫৫] এবং মুক্তি ঘটে জাগতিক বন্ধন থেকে। লালনের অসংখ্য গানে গুরুর মূল্য-মর্যাদা ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায় অনায়াসে। আর গুরু প্রদত্ত দীক্ষা থেকে বাউলেরা পরমতত্ত্ব অনুসন্ধানে ব্রতী হয়।

---

৫০. পূর্বোক্ত পৃ. ১৮৬-১৮৭
৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৪
৫২. ওয়াকিল আহমদ, বাউল গান, ঢাকা : ২০০৬, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬।
৫৩. ওয়াকিল আহমদ, বাংলা লোকসংগীতের ধারা, ঢাকা : ২০০৬, পৃ. ৩৭১।
৫৪. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৫।
৫৫. আজাদুর রহমান, যার আপন খবর আপনার হয় না, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ অক্টোবর, ২০১২, পৃ. ২৭

পরমতত্ত্ব

বাউল সাধকের ধর্মই হচ্ছে যা কিছু জ্ঞাতব্য, গূঢ়তত্ত্ব তা গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা। আর গানের মাধ্যমে এরা 'মনের মানুষ' বা 'আলেক সাঁই' কিংবা পরমপুরুষকে খোঁজে বেড়ান নক্ষত্র খচিত আকাশে, পুষ্পশোভিত বনভূমিতে, আপন-বাহির, মিলন-বিরহের মাঝে।[৫৬] বাউলেরা তাদের আরাধ্যকে নিজস্ব পরিভাষায় অভিহিত করে থাকে যেমন—'মনের মানুষ' 'সহজ মানুষ', 'অধর মানুষ', 'ভাবের মানুষ', 'আলেক সাঁই', 'অচিন পাখি' ইত্যাদি, যা শাস্ত্রের ভাষায় 'আল্লাহ' 'হরি' 'ভগবান', 'ঈশ্বর', 'নিরঞ্জন', 'পরমাত্মা' প্রভৃতি। বাউলেরা হৃদবিহারী 'মনের মানুষ' পাবার ব্যাকুলতায় বেদ-বেদান্ত-শরিয়ত প্রদত্ত পথকে পরিহার করে অবলীলায়।[৫৭] বাউল কবির বলেন, "মন্দিরে বা মসজিদে যদি ভগবান খোঁজ কর তবে ঝগড়া মিটিবে না। তিনি সবার অন্তরে। সকল মানবদেহের মধ্যেই ভগবানকে পাইলে সব ঝগড়া যাইবে মিটিয়া; অন্তরে খোঁজ কর। খোদা যদি মসজিদেই থাকেন তবে বাকি জগৎটা কাহার ? তীর্থে মূর্তিতে রাম থাকিলে কেহই তো তাহাতে তাঁহাকে পাইবে না। পূবে থাকেন হরি, পশ্চিমে থাকেন আল্লা। আরে অন্তরের মধ্যে দেখো খুঁজিয়া, সেখানেই রাম রহিমান।"[৫৮] বাউলেরা প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাস, সনাতন শাস্ত্রাচার, সম্প্রদায়-ধর্মের সংকীর্ণ দেয়াল ভেঙ্গে উদার মিলন ময়দানে 'পরমপুরুষ' বা 'মনের মানুষ'কে মনের মধ্যেই অন্বেষণ করে চলে। আর পরম প্রত্যাশিত 'পরমপুরুষ'কে পাবার জন্য একনিষ্ঠ ভক্তির প্রয়োজন। যেখানে জাত-পাতের বালাই নেই।[৫৯] জাত-ধর্মের মর্মহীন ধর্মকথাকে ভক্তির জোয়ারে ভাসিয়ে লালন উচ্চারণ করেছেন—

ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই।
হিন্দু কি যবন বলে
তার জাতের বিচার নাই ॥

দেহঘরেই যে পরমেশ্বর বিরাজ করে, হদিস জানলেও তাকে দেখা যায় না, ধরতে গেলে ধরা যায় না, তার রূপ-স্বরূপ কি জানা যায় না। এরূপ এক ধূম্রজালে লালনের আকুতি—

সবে বলে প্রাণ-পাখি
শুনে চুপে চুপে থাকি
(ও সে) জল কি হুতাসন
ক্ষিতি কি পবন
আমি ধরতে গেলে পাইনে তারে ॥
আপন ঘরের খবর হয় না
বাঞ্ছা কর মন পরকে চেনা
ফকির লালন বলে, পর
বলতে পরমেশ্বর
(ও সে) কেমন রূপ আমি কোন রূপে রে ॥[৬০]

কিন্তু এত বাধা বিপত্তি ছলনার জালে আচ্ছাদিত পথ তারপরেও লালন তাঁর পরমপুরুষ কিংবা তাঁর ভাষায় 'মনের মানুষে'র সঙ্গে মিলিত হতে চায়। আর এরূপ আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত লালন-চিত্ত-সায়রে হাহাকারে উচ্চারিত—

আমার মনের মানুষের সনে।
মিলন হবে কত দিনে ॥

---

৫৬. বাউল কবি লালন ও তাঁর গান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১।
৫৭. বাংলা লোকসংগীতের ধারা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭২।
৫৮. ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, বাংলার বাউল, ঢাকা : নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ৪৬।
৫৯. আবুল আহসান চৌধুরী, লালন সাঁইয়ের সন্ধানে, ঢাকা : পলল প্রকাশনী, ২০০৭, পৃ. ৪৫।
৬০. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৪।

চাতকে, প্রায় অহর্নিশি
চেয়ে আছি কাল শশী
হব বলে চরণ-দাসী
তা হয়না কপাল গুণে ॥

মেঘের বিদ্যুৎ মেঘে যেমন
লুকালে না পায় অন্বেষণ
কালারে হারালাম তেমন
এ রূপ হেরিয়ে স্বপনে ॥

যখন ও রূপ স্মরণ হয়
থাকে না লোক-লজ্জা ভয়
অধীন লালন বলে সদায়
প্রেম যে করে সেই জানো ॥[৬১]

লালনের এ 'মনের মানুষ' অন্বেষণ রবীন্দ্র বাউলের জীবনদেবতার সাদৃশ্য থাকলেও পার্থক্য এটুকু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেরণাগত একটি উপলব্ধি, যা স্বতন্ত্র এক আধ্যাত্মিক সত্তা, অনুভূতিসর্বস্ব বিমূর্ত ব্যক্তি-সত্তা।[৬২] অন্যদিকে লালন বিচিত্র আরাধনার মধ্য দিয়ে তাকে পেতে চান, ভালবাসতে চান, প্রেম করতে চান। কিন্তু 'পরমপুরুষ'কে পাওয়া পরম দুঃসাধ্য একটি কাজ, কেননা 'সে আর লালন একখানে রয়/ তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে' এরূপ ক্ষেত্রে আগে নিজেকে চিনতে হয় জানতে হয়। নিজকে জানার মধ্য দিয়ে পরমকে পাবার পথ তৈরি হবে এরূপ প্রত্যয়ে লালন বলেন—

আপনার আপন খবর আপনার হয় না।
একবার আপনারে চিনতে পরে যায়
অচেনারে চেনা ॥[৬৩]

কিন্তু তারপরেও পরমাত্মা দয়াল, যাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়, কেননা তিনি ঘোর সংকট কালে ভক্তকে উদ্ধার করেন, আশ্রয় দেন,[৬৪] অগতির গতি দেন এসবই তাঁরই মহান কৃপা। ফকির লালন এভাবেই আত্মনিবেদন করেন গানে—

পারে লয়ে যাও আমায়।
(আমি) অপার হয়ে বসে আছি ও হে দয়াময় ॥

একা রৈলাম ঘাটে,
ভানু সে বসিল পাটে,
তুমি বিনে ঘোর সংকটে, না দেখি উপায় ॥
না জানি ভজন সাধন
চিরদিন কুপথে গমন
নাম শুনেছি পতিত পাবন, তাইতে দেই দোহাই ॥

অগতির না দিলে গতি,
ও নামে রহিবে খেতি
লালন কয়, অকূলের পতি, কে বলবে তোমায় ॥[৬৫]

৬১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৫।
৬২. বাংলা লোকসংগীতের ধারা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭২।
৬৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৪।
৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৫।
৬৫. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৫।

লালনের পরমতত্ত্ব আরও অসংখ্য তত্ত্ব কথায় পরিপূর্ণ—

ক. ‘মনের মানুষ’ হৃদ-বিহারী, কাজেই অনুভবে শুধু তাকে চেনা যায়।

খ. ‘মনের মানুষ’ আপন মনেই লীলা করে চলে।

গ. ‘ভাবের মানুষ’ আপন দেহঘরে সর্বদাই বিরাজমান।

ঘ. ‘অধর’কে অধর দিয়ে ধরতে হয়; পূর্ণ ভক্তি-সাধনায় তাকে (মনের মানুষ) পাওয়া সম্ভব।

ঙ. গুরু নির্দেশিত পথেই তাকে লাভ করা সম্ভব।

চ. আত্মা ও পরমাত্মার মিলনের মধ্য দিয়ে ‘পরম পুরুষ’কে পাওয়া যায়।

ছ. পরমতত্ত্বে পৌঁছতে হলে সাধনার ভেদ-অভেদ জানতে হবে—থাকতে হবে তন্ত্র-যোগ সাধনা, দেহ পরীক্ষায় পাশ করিয়ে তারপর অচিন দেশে পৌঁছতে হবে।

জ. কামকে কর্মের দেশে পৌঁছাতে হবে, তবেই সফলতা আসবে।

ঝ. সমাজ-শাস্ত্র-সংস্কার-আইন-বেদ-বেদান্ত মানুষকে বিভেদের সর্বনিম্নে স্থান দিয়েছে। লালন এগুলোকে মূল্যহীন করে ‘মানুষ ধর্মের’ সাধনায় রত ছিলেন।

ঞ. ‘অধর মানুষ’ বা ‘সহজ মানুষ’ ধরতে পূর্ণ আত্মসমর্পণই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এর মধ্যে যেমন ‘পরমপুরুষ’কে হাসিল করা যায় তেমনি লাভ করা যায় মুক্তির পরমানন্দ। তার এরূপ প্রয়োজনেও দৃঢ় প্রেম ও ভক্তির যোগ থাকতে হয়।

প্রেম ও ভক্তি

লালনের গানে প্রেমের দুটি চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে- সকাম ও নিষ্কাম। নারী পুরুষ যেভাবে দিন ক্ষণ স্থির করে দৈহিক মিলনে লিপ্ত হয়, সেভাবে বাউলেরা সময় সুযোগ সন্ধান করে পরম প্রিয়ার সাথে মিলিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলে সাধনায় সফল হওয়া যায় না। বাউল লালন বলেন—

> সময় বুঝে বাঁধাল বাঁধলে না।
> জল শুকাবে মীন পালাবে, পস্তাবিরে মন কানা।[৬৬]

তাই বাউল গানে মিথুনাত্মক যোগসাধনায় নর-নারী তথা সাধন-সঙ্গিনীর যে দৈহিক মিলন তা গুরুর নির্দেশেই হয়। এমন কি প্রয়োজন হলে গুরুর উপস্থিতিতেই সম্পন্ন হয়। বিশেষ সময়ে বিশেষ প্রক্রিয়ায় পুরুষ প্রকৃতির এ মিলন বাউলের ধর্মে সিদ্ধ। বিশ শতকের গোড়ার দিকে ‘বাউল ধ্বংস আন্দোলনে’র অন্যতম অভিযোগ ছিল অবাধ যৌনলীলা ও নানাবিধ অশ্লীল আচার আচরণ।[৬৭] কিন্তু বাউলদের এ বিষয়ে বক্তব্য হচ্ছে দেহবাদী জটিল ও দীর্ঘমেয়াদী যোগ সাধনার মধ্য দিয়ে সকাম প্রেম সাধনার মধ্য দিয়ে নিষ্কাম প্রেম-সাধনায় উত্তীর্ণ হতে হয়।[৬৮] আর না হলে প্রেম সাধন সম্ভব নয়। কামরাজ মদন যদি এই সুযোগ পায় তাহলে প্রকৃত প্রেমের রসাস্বাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তাই প্রেমিক লালনের উচ্চারণ—

> প্রেম রসিকা হবো কেমনে।
> করি মানা কাম ছাড়ে না মদনে ॥
> এই দেহেতে মদন রাজা করে কাতারি
> কর আদায় করে লয়ে যায় হুজুরি
> মদন তো দুষ্ট ভারি তাঁরে দেয় তহশিলদারি
> করে সে মুন্সীগিরি গোপনে ॥[৬৯]

---

৬৬. অধ্যাপক আনোয়ার্ল করীম, বাউল সাহিত্য ও বাউল গান, কুষ্টিয়া : লোক সাহিত্য গবেষণা কেন্দ্র, ২১ শে ফেব্র্য়ারি, ১৯৭১, পৃ. ৯৫।

৬৭. বাংলা লোকসংগীতের ধারা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৫।

৬৮. বাউল সাহিত্য ও বাউল গান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪।

৬৯. আবদেল মাননান সম্পাদিত, লালনসমগ্র, ঢাকা : ২০০৭, পৃ.৫৬৫।

এজন্য কঠোর সাধনার প্রয়োজন। কামকে যেমন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তেমনি করে পঞ্চ-ইন্দ্রিয় কিংবা ষড়রিপুর সংযম সাধনের মধ্য দিয়ে প্রকৃত প্রেমের স্বাদ গ্রহণ করা সম্ভব। বৈষ্ণব ধর্মে—আত্মা-পরমাত্মার মিলনে মহৎ প্রেমের সৃষ্টি হয়েছে। সুফিদের আশেক-মাশুকের প্রেমে ইশকের সৃষ্টি হয়েছে। সুফিরা ফানাফিল্লাহর মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধি বা বাকাবিল্লাহ স্তরে পৌঁছেন আর বাউলেরা 'দশম দশা' অর্থাৎ 'জ্যান্তে-মরা' পর্যায়ে উপনীত হন। লালন শাহ তাই প্রেমের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন প্রসঙ্গত তা উল্লেখযোগ্য—

জেন্তে মরা প্রেম-সাধন কি পারবি তোরা।
যে প্রেমে কিশোর-কিশোরী হয়েছে হারা ॥
শোষায় শোষে না ছাড়ে বান,
ঘোর তুফানে বায় তরী উজান।
ও তার কাম-নদীতে চর পড়েছে,
প্রেম-নদীতে জল পোরা॥
হাঁটতে মানা, আছে চরণ,
মুখ আছে তার, খাইতে বারণ।
ফকির লালন কয়, এ যে কঠিন মরণ-
তা কি পারবি তোরা ॥[৭০]

আবার শুদ্ধ প্রেমের আরতি ব্যতীত পরমপুরুষ কিংবা 'আলেক সাঁই'কে পাওয়া যায় না। লালন তাই গানে বলেন—

যার নাম আলেক মানুষ আলেকে রয়।
শুদ্ধ প্রেম রসিক বিনে কে তারে পায় ॥[৭১]

শুদ্ধ প্রেম রসিকের চিত্তেই ভক্তি জন্মে। আর 'ভক্তির জোরে জাল না দিলে টান দিলে জাল উঠে খালি'। তাই প্রেম-ভক্তির মধ্য দিয়ে অধরাকে ধরা যায়। এ ছাড়া যে মওলার দীদারও সম্ভব নয়। লালনের গানে ধ্বনিত হয়েছে—

ভক্তি না হইলে মওলা
দীদার কি মেলে।[৭২]

আর প্রেম-ভক্তির দুর্নিবার আকর্ষণে হিন্দু-যবনের ভেদাভেদ নেই। হৃদ-বিহারী বাউল মন ভক্তির অর্ঘ নিবেদন করে মুক্ত উদার হৃদয়ে। নীতি-শাস্ত্র-বর্ণ-সম্প্রদায় সব কিছুর উর্ধ্বে যে পরমেশ্বর, তারই উচ্চোকিত দাবী ভক্তের অন্তরে। লালনের গানে এ কথাই বলা হয়েছে—

ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছে সাঁই।
হিন্দু কি যবন বলে জেতের বিচার নাই ॥
শুদ্ধ ভক্তি মাতোয়ালা
ভক্ত কবির জেতে জেলে;
যে না ধরেছে সে ব্রজের কালা
তার সর্বস্ব তাই ॥[৭৩]

---

৭০. বাউল গান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১।
৭১. মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, হারামণি ১ম খণ্ড, কলকাতা : বৈশাখ ১৩৩৭, পৃ. ৪১।
৭২. বাউল গান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৬।
৭৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭।

আর ভক্তের ভক্তির সম্বন্ধে তাই শ্রীচৈতন্য বলেছেন 'চণ্ডাল চণ্ডাল নহে, যদি কৃষ্ণ ভজে'। লালনের প্রেম ও ভক্তিতত্ত্বে এরূপ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া চুম্বক তত্ত্বগুলো তাঁর গানে পাওয়া যায়। তবে একথা ঠিক—শুদ্ধ প্রেম, সহজ সাধন, তন্ত্র- যোগ প্রভৃতি পদ্ধতিগত বিষয়ে গুরুর শরণাপন্ন হতে হবে। গুরুই কেবল গুরুত্ব সহকারে সহজেই 'সহজ পথে'র সন্ধান দিতে পারেন এবং সহজ করে বাতলে দিতে পারেন সাধন জগতের নির্দেশনা।

সাধনতত্ত্ব

'মাঝে মাঝে বদ্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন পাখি বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়—মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায় কিন্তু পারে না।'[৭৪]

রবীন্দ্র বাউলের এ অনুভূতির কথা শুধু নয়; এখানেই নিহিত রয়েছে বাউলের সাধনার কথা। আছে লালনের অচেনার চেনার কথা। সাধনতত্ত্বে লালন একেবারে উদার—কিভাবে সাধন রীতি-পদ্ধতি অনুযায়ী সাধনার দীর্ঘ জটিল-অনিশ্চিত ও রহস্যময় পথ অতিক্রম করতে হবে তা তিনি সরাসরি বিবৃত করেছেন। গুরু-আসন থেকেই যেন শিষ্যদের উদ্দেশ্যে অধিকাংশ সাধনতত্ত্বের গান রচিত হয়েছে। আদেশ-উপদেশ নিষেধের পরে তিনি পরামর্শ প্রদান করেছেন কি করতে হবে। তাই লালন বলেন—

সপ্ত তালা ভেদ করিলে
হাওয়ার ঘরে যাওয়া যায়।
হাওয়ার ঘরে গেলে পরে
অধর মানুষ ধরা যায়।[৭৫]

যুগ যুগ ধরে বাউল-পন্থীদের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ এরা শাস্ত্র তথা সরাশরিয়ত মানে না। বিশেষ করে ইসলামপন্থীদের দৃষ্টিতে এগুলো বেদাত তথা মহাপাপের কাজ। অদ্যাবধি লালনপন্থীরা এর বাইরে নয়। কিন্তু অভিজ্ঞ লালন তাঁর সাধনায় শরিয়তকে যেমন উড়িয়ে দেননি তেমনি মারফতকে শক্ত করে ধরার তাগিদ দিয়েছেন যুক্তিনিষ্ঠভাবে। কাজেই শরিয়ত বড় না মারফত বড় এ প্রশ্নের যথার্থ মীমাংসা পাওয়া যায় লালন ফকিরের গানে—

যদি শরায় কার্য সিদ্ধি হয়,
তবে মারফতে কেনে মরতে যায়॥
শরিয়ত আর মারফত যেমন
দুগ্ধেতে মিশালে মাখন
মাখন তুললে দুগ্ধ এখন
ঘোল বলে তাতো জানে সবায়॥[৭৬]

এছাড়া শাস্ত্র বেদ-বেদান্ত যে অন্তঃসারশূন্য একটি মেকি বিষয়; সে সম্বন্ধে লালন তাঁর গানে উল্লেখ করেছে করেছেন :

আমি ঢাকা দিল্লী হাতড়ে ফিরি
আমার কোলের ঘোর তো যায় না
আত্মারূপে কর্তা হরি
মনে নিষ্ঠা হলে মিলবে তারি
ঠিকানা ।
বেদ বেদান্ত পড়বে যত

৭৪. রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, ঢাকা : ৩য় মুদ্রণ, ২০০৬, পৃ. ৫২৬।
৭৫. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৯।
৭৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২১।

বেড়বে তত লখনা
আমি আমি কে বলে মন
যে জানে তার চরণ শরণ
লও না।
সাঁই লালন বলে বেদের গোলে
হলেম চোখ থাকিতে কানা।[৭৭]

প্রকৃত সাধক কে? এবং কিভাবে এ সাধনা করতে হয় তার দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন। সাধকের ধৈর্য এবং একনিষ্ঠতাকে তিনি চাতক পাখির স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। শুধু কথার ফুল-ঝুড়ি উড়িয়ে নয় বরং প্রকৃত সাধনায় উপনীত হওয়া সাধকের কাজ। তাই লালন বলেন—

চাতক-স্বভাব না হলে
অমৃত মেঘের বারি কথায় কি মেলে ॥
মেঘে কত করে ফাঁকি
তবুও চাতক মেঘের ভুখি
তেমনি নিরিখ রাখলে আঁখি
সাধক বলে।[৭৮]

সাধক লালন আরও বলেছেন,

১. কামের ঘরে কপাট মেরে
উজান মুখে চালাও রস
দমের ঘর বন্ধ রেখে
যম বাজারে কর বশ॥

২. মরণের আগে মরে
শমনে ছোবে না তারে
শুনেছি সাধুর দ্বারে
তাই বুঝি করেছ ধনি॥

৩. আপ্ততত্ত্ব জানে যে
সব খবরের জবর সে॥

৪. ত্রিবেণীর পিছন ঘাটে
বিনে হাওয়ায় মৌজা ছোটে
এ সে বোবায় কথা কয়
কালায় শুনতে পায়
আন্ধেলাতে পরখ করছে সোনা ॥

৫. রাগ-অনুরাগ বাঁধা আছে যার
সোনার মানুষ উজ্জ্বল হৃদকমলে।

সাধনার বিরামহীন পথচলার মধ্য দিয়ে 'নিগম বিচারে সত্য তাই গেল জানা'; আবার 'বড় রসিক বিনে' সে সত্যকে উপলব্ধি করা যায় না; সাধনে সিদ্ধ না হলে 'আমার ঘরের চাবি' পরেরই হাতে চলে

---

৭৭. অন্নদাশঙ্কর রায়, লালন ও তাঁর গান, কলকাতা : ১৩৮৫, পৃ. ৭১।
৭৮. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৩-২৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

যায়; সাধনার বিচিত্র রূপময় জগত একনিষ্ঠ নিমগ্নতায় নিমিষেই ধরা দেয়—'যেমন ডুবে আছে সেই রূপ সাগরে/ রূপ বাতি দিবারাতি জ্বলছে তার অন্তরে।'

তাই তো বাউলের গান সম্পর্কে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক যথার্থ উল্লেখ করেছেন :

> 'এ সঙ্গীতের তালে প্রাণের সুপ্ত বাসনা জাগরিত হয় না, লুপ্ত কামনা মাতিয়া উঠে না, ইহা ক্ষুধিত আত্মাকে অর্নিদেশের সন্ধানে, অজানার লক্ষ্যে টানিয়া লইয়া যায়'।[৭৯]

বাউল লালনের গানেও যেন আলোচ্য কথাগুলোর অনুসরণ আমাদেরকে তত্ত্বকথার অচিনপুরে নিমন্ত্রণ জানায়। নবিতত্ত্ব, গৌরতত্ত্ব এ সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক গানগুলোতে মানব সৃষ্টির রহস্য বর্ণিত হয়েছে। আহাদ আহমেদের কথা এসেছে তেমনি এসেছে রাধা-কৃষ্ণের কথা। মনসুর হাল্লাজ প্রমুখ যেমন আত্মা ও পরমাত্মার অভিন্নতা ঘোষণায় 'হুলুল' বা অবতারবাদের আশ্রয় নিয়েছিলেন লালন তেমনি আত্মার অসৃষ্ট স্বরূপ বর্ণনায় 'অবতার' শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন— 'উপর-আলা সদর বারি আত্মারূপে অবতরি।' অর্থাৎ আত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ককে শুধুমাত্র 'সৃষ্টি' শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই 'অবতার' শব্দটি এক্ষেত্রে অধিক যুক্তিগ্রাহ্য। লালন আরও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন—'আল্লা-নবী দুটি অবতার যার অর্থ হলো রসুল রূপে প্রকাশ রব্বানা।' তিনি আল্লা ও নবীর সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে বীজ ও গাছের উপমা ব্যবহার করেছেন। যেমন বীজ থেকে গাছের উৎপত্তি হয়, তেমনি আল্লাহ থেকে নবী কিংবা রব্বানা থেকে রসুলের প্রকাশ। আল্লাহ ও নূরনবী, নবী বা রসুল, আহাদ ও আহমদ সাধারণ অর্থে কেবলমাত্র স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক শুধু নয়।[৮০] লালনের মতে আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা আর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ইচ্ছাক্রমে 'কুন' বা 'হও' শব্দটি উচ্চারিত হওয়ার সময় শূন্য বা প্রচলিত অর্থে অবিদ্যমান সত্তা তথা আল্লাহর স্বরূপ সত্তাসার থেকে সমগ্র সৃষ্টির বীজ সৃষ্টি হয়। অবশ্য 'শূন্য' থেকে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বাইবেল. ঋগ্বেদে দেখা যায়।[৮১] জল বা নীর, মাটি, বায়ু ও অগ্নি এ উপাদান চতুষ্টয় এবং ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম এ পাঁচটি উপাদান লালনের গানে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এ সবের সৃষ্টির মূলে রয়েছে স্বয়ং আল্লাহ।[৮২] সৃষ্টিতত্ত্বে লালন আরও পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন আল্লাহ তথা জহুরী কুদরতি থেকে হাওয়া-আদমের উৎপত্তি। পরে এই নূরেই বিবর্তিত হয়ে পিতার বীজ ও মাতার রজঃ আকার ধারণ করে ও উভয়ের মিলনের ফলে মানুষের উৎপত্তি। তাই তিনি এভাবে উল্লেখ করেছেন—

'পিতার মস্তকে বীজ নাম
মায়ের সেকমে রক্তজবা
আদম দুনিয়ায়।'[৮৩]

আর এ রজঃ-বীর্যই বাউলের সাধনার মূল মন্ত্র। এবং তা সৃষ্টিতত্ত্বের প্রধান অনুসঙ্গ বটেও।

কোরানের বাণী 'আলিফ-লাম-মীম'-এর আশ্রয় গ্রহণ করে লালন বলেছেন—আল্লাহ্, নবী ও আদম যেন বীজ, অঙ্কুর ও গাছ। আল্লার একই নূর আহাদিয়াত অবস্থায় অব্যক্ত, অপ্রকাশ্য, অচিন, অজ্ঞেয়। ওয়াহদানিয়াত অবস্থা বা নূর-নবী অবস্থা কিঞ্চিৎ ব্যক্ত, সামান্য প্রকাশিত নূর। ওয়াহাদিয়াত অবস্থা নূরে আদম অবস্থায় অধিকতর ব্যক্ত এবং জাগ্রত। এরূপ অবস্থার বর্ণনা লালনের গানে এভাবে উচ্চারিত হয়েছে—

আলিফ লাম মীম আহাদ নূরী!
তিন হরফের মর্ম ভারি॥
আলিফেতে আল্লা হাদি
মীমেতে নূর মুহম্মদ

---

৭৯. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মনীষা-মঞ্জুষা, ঢাকা : মুক্তধারা ১৯৭৫, পৃ. ২০৭-২০৭।
৮০. মো. সোলায়মান আলী সরকার, লালন শাহের মরমী দর্শন, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ. ১৪০।
৮১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১।
৮২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪
৮৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯।

লামের মানে কেউ করলে না,
নুক্তা বুঝি হলো চুরি॥[৮৪]

এছাড়াও লালন তাঁর গানে উল্লেখ করেছেন আল্লাহ্‌র নূর থেকে নবীর নূর সৃষ্টি আর নবীর নূর থেকে সমগ্র জগতের উৎপত্তি হয়েছে। লালনের গানে আদম, ইব্রাহিম, ঈসা, মুসাসহ অন্যান্য নবীদেরও কথা এসেছে। কিন্তু তিনি হযরত মুহম্মদকে ত্রিভুবনের স্বর্গ, মর্ত ও পাতালের ছায়া দাতা এবং তিনি আল্লাহ্‌ রূপেও বিরাজমান বলে উল্লেখ করেছেন। তাই লালন বলেছেন :

আত্মতত্ত্বে ফাজেল যে জনা
জানতে পায় সে নিগূঢ় কারখানা
হলো রাসুল রূপে প্রকাশ রাব্বানা
লালন বলে দরবেশ সিরাজ সাঁইর গুণে॥[৮৫]

নবীতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় ড. এস. এম. লুৎফর রহমান[৮৬] হযরত মুহম্মদ এঁর রূপকে আর একজন নির্দেশ করেছেন এবং লালন যে দুজন নবীর উল্লেখ করেছেন এরূপ মন্তব্য সঠিক নয়। আবার মোঃ সোলায়মান আলী সরকার[৮৭] নূর-নবী ও শেষ নবী হযরত মুহম্মদ এঁর মধ্যেও পার্থক্য নির্দেশ করেছেন এ বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়। বরং লালন নিজেও এ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন—

কোন নবী হইল ওফাত
কোন নবী বান্দার হায়াত
নিহাজ করে জানলে নেহাত
যাবে সংশয়॥[৮৮]

শেষ নবী হযরত মুহম্মদকে লালন অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁরই ‘দামন’ বা ‘পাগড়ী’ ধরে তিনি সাধনার জগতে উপনীত হতে চেয়েছেন। তাই তো তাঁর সাধনায় মুর্শিদ-নবী ও খোদা অভিন্ন হয়ে ধরা দিয়েছে—

যেহি মুর্শিদ সেই তো রাছুল
ইহাতে নেই কোন ভুল
খোদাও সে হয়;
লালন কয়না এমন কথা
কোরানে কয়॥[৮৯]

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর রাধা-কৃষ্ণবাদের অত্যধিক প্রচারের ফলে শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব হিসেবে মানুষ, সহজ কিংবা মনের মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। বাংলার ধর্ম জগতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে রাধা-কৃষ্ণবাদের এবং প্রেম-ধর্মের অনুপ্রেরণায় বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মের একটি প্লাবনে পূর্বের বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী ফকির সম্প্রদায়ও রাধা-কৃষ্ণবাদে এবং চৈতন্য-তত্ত্বে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। আর এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত লালনের বহু গানে রয়েছে।[৯০] জগতে পুরুষ কৃষ্ণের প্রতীক আর রাধা নারীর প্রতীক হিসেবে সহজ প্রেমের প্রতিচ্ছবিতে শ্রীচৈতন্য একাকার হয়েছেন এভাবে—

মন জানো সেই রাগের করণ।

---

৮৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৯।
৮৫. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, লালন শাহ ও আত্মদর্শন, আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত লালনসমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯০।
৮৬. লালন-গীতি চয়ন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১।
৮৭. লালন শাহের মরমী দর্শন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৯।
৮৮. ফকির আনোয়ার হোসেন মন্টু শাহ সম্পাদিত লালন-সঙ্গীত ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১।
৮৯. লালন-সঙ্গীত ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬।
৯০. বাংলার বাউল ও বাউল গান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৬।

যাতে কৃষ্ণ বরণ হল গৌর বরণ॥
শত-কোটি গোপীর সঙ্গে, কৃষ্ণ-প্রেম রস রঙ্গে
সে যে টলের কার্য নয় অটল না বলায় সে আর কেমন॥
রাধাতে কিভাব কৃষ্ণরো কি ভাবে বস গোপী তারো
সে ভাব না জেনে সে সঙ্গ কেমনে পাবে কোন জন॥[৯১]

সুফি, বৈষ্ণব ও নাথ মতবাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।[৯২] যুগল ভজন-সাধনার মধ্য দিয়ে বাউলদের রচনায় তত্ত্ব ও দর্শনের দিক দিয়ে এক অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে।[৯৩]

দর্শন

'দৃশ্য' ধাতুর সঙ্গে 'অন' প্রত্যয় যোগে 'দর্শন শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। 'দৃশ' ধাতুর অর্থ হচ্ছে দেখা। এ দেখাকে আমরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষণ বলি। তবে এখানে বিষয় এরূপ নয়, এখানে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষণ শুধু নয় বরং জীব ও জগতের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধিকে বুঝায়।[৯৪] অর্থাৎ চর্মচক্ষু দিয়ে আমরা যা দেখি তা দর্শন বটে, কিন্তু তা শাস্ত্রীয় দর্শন নয়; দর্শন শাস্ত্রানুযায়ী দ্রষ্টার মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ও উপলব্ধির প্রতিফলনই বড় কথা। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস বলেছেন, 'জ্ঞানই শক্তি, জ্ঞানই ধর্ম এবং জ্ঞানই প্রকৃত আনন্দ'।[৯৫] সত্যের যুক্তিনিষ্ঠ অনুসন্ধান, প্রজ্ঞা ও অনুভূতির প্রেক্ষিতে জীবন ও বিশ্বের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দর্শনে পাওয়া যায়। বাউল লালন তাঁর জীবন ও জগতের মধ্যে সৃষ্টি ও স্রষ্টা, মানবজীবন, ইহলোক ও পরলোক এবং মৃত্যুকে কিভাবে দেখেছেন তা গানের সুর ও বাণীতে তিনি রূপ দিয়েছেন তার মধ্যে লালন-দর্শনকে অনুসন্ধান করতে হয়। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম লালনকে আবিষ্কার করেন, লালনের গানের অন্যান্য দিকের চেয়ে তত্ত্ব-দর্শনকে প্রাধান্য দিয়ে। তিনি ভারতীয় দর্শন মহাসভায় The philosophy of our people (১৯২৫), ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত সভায় An Indian Folk Religion (১৯২৮), ব্রিটেনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হিবার্ট বক্তৃতায় Religion of Man (১৯৩০) বিষয়ে ভাষণে লালন-গগন-হাসন রাজার গানের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেন। বিশেষত লালনের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি' গানটির ব্যবহারে প্রতীত হয় যে দর্শনগত দৃষ্টিতে তাঁকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছিল। এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিষয়বস্তু 'মানবধর্ম' শব্দটি নির্বাচন করায় জাত-ধর্ম-কর্ম-বর্ণ বিষয়ে এ ভারতীয় উপমহাদেশে লালনের ধর্ম-দর্শন থেকে আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন। শাস্ত্রে বাহ্য ধর্ম-কর্মের ওপর জোর দেয়া হয়, অন্যদিকে বাউলেরা অন্তর্ধর্মের পূজারী। বাউল-দর্শনে হৃদয়ধর্মের কথা থাকে, যেখানে ধর্ম-কর্ম-বর্ণের ভেদাভেদ থেকে মুক্ত হয়েছে মানুষ। ভারতবর্ষে চারটি প্রধান ধর্ম—ইসলাম ধর্ম, হিন্দুধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম। এদের চারটি আলাদা শাস্ত্র (কোরান, বেদ-গীতা, বাইবেল, ত্রিপিটক) আছে, চারটি উপাসনালয় (মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, মঠ) তেমনি রয়েছে চারটি তীর্থস্থান (মক্কা-মদিনা, পুরি-কাশি, বুদ্ধগয়া, জেরুজালেম)। এরূপ ভিন্নতায় বিশেষত হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত বঙ্গভূমিতে দ্বন্দ্ব-বিবাদ আদিকাল থেকে বিরাজমান।[৯৬] এ প্রেক্ষাপটে বাউলেরা এরূপ শাস্ত্রীয় ধর্মের সমস্ত অনুশাসনকে পদদলিত করে নিজের মধ্যেই পরম দেবতাকে অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। আর তাই বেদ-কোরান, মসজিদ-মন্দির, মক্কা-কাশি কোন কিছুই প্রয়োজন তাঁরা মনে করে না। বরং সবার উপর মানুষের সাধনাই বড় সত্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রশংসা করে বলেছেন—'আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরতম গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন ক'রে এসেছে। বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি, এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই, একত্র হয়েছে, অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনে সভাসমিতির

---

৯১. সুব্রত রুদ্র, লালনের গৌরগান, কলকাতা : ১৯৯৩, পৃ. ৪৫।
৯২. বাংলা লোকসংগীতের ধারা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৭।
৯৩. ড. মৃদুলকান্ড়ি চক্রবর্তী, লোকসঙ্গীত, ঢাকা : প্যাপিরাস, জানুয়ারী ১৯৯৯, পৃ. ৩৯।
৯৪. ড. এম মতিয়ার রহমান ও ড. মুহম্মদ আবদুল হাই ঢালী, দর্শনের মূলনীতি, ঢাকা : ৩য় সংস্করণ, ২০০৯, পৃ. ১৮।
৯৫. মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী সম্পাদিত বাংলাদেশের লোকসংগীত পরিচিতি, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩, পৃ. ৩৬১।
৯৬. বাংলা লোকসংগীতের ধারা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৮।

প্রতিষ্ঠা হয়নি, এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্য্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরান-পুরাণে ঝগড়া বাধেনি'।[৯৭] বাউল লালনের হৃদবিহারী মন সবার উপরে মানুষ সত্য তত্ত্বকথাকে যেন হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করলেন, মানুষের মাঝেই 'মানুষ রতন' অন্বেষণে তিনি মানুষের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে জন্ম দিলেন বিশ্বমানবতাবাদের দর্শন :

মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি
মানুষ ছেড়ে খ্যাপারে, তুই মূল হারাবি ॥
দ্বি-দলের মৃণালে
সোনার মানুষ উজলে;
মানুষ-গুরুর কৃপা হলে
জানতে পাবি।[৯৮]

বাউলেরা মানুষের মাঝে 'মানুষ রতন'কে অনুসন্ধান করে। মূলত তারা মানুষ ভজন-সাধনের মধ্য দিয়ে পরমাত্মার সন্ধান করে। 'শাস্ত্রের চেয়ে বাউলের নিঃশব্দ মরম-কথা মহত্তর। প্রাণহীন শাস্ত্র অপেক্ষা মানবীয় প্রেম অনেক বেশি সত্য'।[৯৯] তাই বাউলের আত্মদর্শন, জীবদর্শন, অধ্যাত্ম দর্শনের পরিচয় নিহিত আছে হৃদয়ধর্ম তথা মানবধর্ম বা মানবতাবাদে। তাই বাউলেরা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিপক্ষে অখণ্ড মানবধর্মের পক্ষে জয়গান করেছেন, তেমনিভাবে লালন ধর্মকথায় মর্মহীন বাণীকে অগ্রাহ্য করে প্রকৃত ভক্তের স্বরূপ নির্ধারণ করে 'মনের মানুষ'কে উপলব্ধি করেছেন। শুধুমাত্র ভক্তিরসেই তাকে পাওয়া যায়, জাত-বেজাতের প্রসঙ্গ নিরর্থক। কেননা, লালনের দৃঢ় প্রত্যয়—

ভক্তের দ্বারে বাধা আছেন সাঁই।
হিন্দু কি যবন বলে
তার জাতের বিচার নাই।

এখানেও মানবতাবাদের চরম পরাকাষ্ঠায় লালন-দর্শন উচ্চ শিখরে। মানবতাবাদের সঙ্গে বাউলদের ইহজাগতিকতাকেও প্রাধান্য দিয়েছে। বাউল গানে ইহজাগতিকতা নয় আবার পরকাল সর্বস্বতাও নয়। বরং এই দুইয়ের মাঝে জন্ম নিয়েছে দেহাত্মবাদী দর্শন। যার মূল ভিত্তি নিহিত রয়েছে একটি মৌলিক তত্ত্বে 'যা আছে ভাণ্ডে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে'। মানবদেহ ভাণ্ড আর বিশ্বলোক ব্রহ্মাণ্ড হিসেবে পরিগণিত করে জীবদেহে জীবাত্মার বাস আর বিশ্বলোকে পরমাত্মা; জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনে জীবনের পরম পরিসমাপ্তি।[১০০] সুফি মতে 'আশেক-মাশুক' তত্ত্ব বলা হয়। বাউল তথা লালন মনে করেন পরমাত্মা মানবদেহেই বাস করে। তিনি 'মীন' বা বিন্দুরূপে মানবদেহে বিরাজ করেন এবং সাধকের কাজ হলো এ বিন্দুরূপী পরমাত্মাকে অনুসন্ধান করা এবং তাকে পাওয়া।[১০১] এজন্যই মানবদেহ বাউলদের সাধনার বিষয়। তাই লালনের মত—'এমন মানব জমিন রইল পতিত চাষ করলে ফলত সোনা'। পরমসত্তা যে আপন দেহই অবস্থান করে, 'আমি একদিনও না দেখিলাম তারে, বাড়ির কাছে আরশিনগর, এক পড়শী বসত করে'। লালনের বিলাপের সবচেয়ে আরও একটি বড় কারণ 'সে আর লালন একখানে রয়, থাকে লক্ষ যোজন ফাঁকরে'। কাজেই অরূপ রতন পরম সত্তা দেহের মাঝেই যে বাস করে লালন-উপলব্ধি সার্থক হয়েছে। তাই দেহ সাধনার কথা এসেছে, দেহ চাষের কথা এসেছে, এসেছে যোগাদির কথা। চিত্তশুদ্ধির মধ্য দিয়ে রিপুসচেতন সাধক লালন কাম, ক্রোদ্ধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য তথা প্রবৃত্তিসমূহের দমন ও বিনাশ করতে চেয়েছেন। তিনি কামকে সুনিয়ন্ত্রিত করে প্রেমসাধনা করতে চেয়েছেন, 'কাম হলো সেই প্রেমের লতা, কাম ছাড়া প্রেম পায় কি গতি'। তাই

---

৯৭. হারামণি ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, আশীর্ব্বাদ, পৃ. ১/০
৯৮. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৯।
৯৯. বাংলার বাউল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩।
১০০. বাংলা লোকসংগীতের ধারা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮০।
১০১. ওয়াকিল আহমদ, লালন সঙ্গীতে ধর্মীয় দর্শন, ঢাকা : বেতার বাংলা, ভাদ্র, দ্বিতীয় পক্ষ, ১৩৯৬, অষ্টাদশ বর্ষ, চতুর্দশ সংখ্যা, পৃ. ৮৩।

একেবারে নিষ্কাম প্রেম লালনের আদর্শ-বিরুদ্ধ দর্শন।[১০২] কামের ঘরে কপাট মেরে সাধনার অগ্রসর হতে চেয়েছেন লালন। হতে চেয়েছেন আপ্তনাশ, চেয়েছেন অহং এর মৃত্যু। বাউল পরিভাষায় যাকে 'জ্যান্তেমরা' বলা হয়; সাধনার এ স্তরে পৌঁছলে তাকে পাওয়া সম্ভব। লালন যেমন পরিশুদ্ধ দেহে সাধনার উচ্চস্তরে পৌঁছতে চেয়েছেন তেমনি পরিশুদ্ধ আত্মায় ভক্তি প্রেমে নিজেকে উদ্ভাসিত করতে দেহ-চিত্তের সম্মিলনে বলেন, 'ভক্তির জোরে জাল না দিলে টান দিলে জাল উঠে খালি'। কবীর, রজব, চৈতন্যদেব, রামদাস, হীরাবাঈ এরা তো ভক্তিবাদেরই অনুসারী ছিলেন। এছাড়াও লালন নিজেকে বিশ্লেষণ করেছেন, আত্মতত্ত্বে নিজের অনুভূতি—

> আমার আপন খবর আপনার হয় না।
>
> সে যে আপনারে চিনলে পরে, যায় অচেনারে চেনা ॥[১০৩]

আত্মতত্ত্ব আর পরমতত্ত্বে গভীরে পৌঁছে বাউলেরা সংসারবিমুখ হয়। গৃহ থেকে গৃহহারা, মর্ত্যজগৎ থেকে মৃত-জগতে, জন্ম নেয় বৈরাগ্যের; সমাজ-সংসার থেকে পালিয়ে বেড়ায় বিবাগী মন; জগৎ-সংসার-দারা-পুত্র-পরিজন সবই তুচ্ছ, সঙ্গী কেবল একতারা কিংবা দোতারা বা বাদ্যের কোন কিছু। অবশ্য তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজে নিজেকে 'একঘরে' করে রাখা। এই নৈরাজ্যবোধ কোন সময় সমাজ-সংসার থেকে আরোপিত কখনও ইচ্ছাকৃত। কারণ জাগতিক মোহ সাধনার চরম অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, তাঁরা উদাসী কিন্তু ঠিকানা আছে পথ আছে, মোহাবৃত্ত জগৎ-সংসার মেকি-মূল্যহীন; অন্তহীন পথের অভ্রান্ত এ পথিক মুক্তি পেতে চায় মিলিত হতে চায় পরমপুরুষের সাথে; ভগবৎ-সত্তার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করতে তাঁরা প্রয়াসী। আপাতত দৃষ্টিতে তাদেরকে দিকভ্রান্ত মনে হলেও তাঁরা নির্দিষ্ট দিকে ধাবিত হয়, নিজেদের তৈরি করা সাধনার কক্ষপথে আবর্তিত হয়ে মুক্তির বারতা মানুষের কাছে পৌঁছায়। তাঁরা নিজেরা মুক্তি পাগল তেমনি সর্বমানুষের অন্তরে এ পথ দেখাতে নিবেদিত। রবীন্দ্রনাথের নাটকে-গল্পে-উপন্যাসে বাউল চরিত্রকে মুক্তি ও আনন্দের প্রতীক হিসেবে এজন্যই দেখানো হয়েছে। সুতরাং বাউল দর্শন বৈরাগ্যবাদের ভিত্তি উপর মানবতাদের জয়গান করে মুক্তির পরমানন্দে বিভোর। আর এটাই হচ্ছে লালন-দর্শনের মূলকথা। লালনের গানের এরূপ তত্ত্ব-দর্শন বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। লালন তথা বাউলের গানকে জাতিসঙ্ঘের ইউনেস্কো 'a masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity' হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এর ফলে লালনের গানের ব্যাপক পরিচিতির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

---

১০২. ড. খোন্দকার রিয়াজুল হক সম্পাদিত, লালন সাহিত্য ও দর্শন, ঢাকা : সাহিত্যিকা, এপ্রিল, ২০০৩, পৃ. ২৪৭।
১০৩. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭।

তৃতীয় অধ্যায়

লালনের গানের ভাব, ভাষা ও আঙ্গিক কাঠামো

ভাব

লালন শাহের গান জীবনবোধে এক উচ্চতর ভাবনাস্নাত হয়ে জন্ম দিয়েছে গভীর ভাবতত্ত্বের। জীবন-জগৎ আর অধ্যাত্ম সাধনায় নিমগ্ন লালন চিত্তে ভাবের আতিশয্যে শিষ্যদেরকে আহ্বান করতেন 'ওরে আমার পুনা মাছে ঝাঁক এসেছে'। শিষ্যরা গুরুর এ আহ্বান শুনামাত্র সকলে একত্রিত হয়ে গুরুর গানে—ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে ভাবের সেই অচিনপুরের সন্ধান করতেন। আর এ পোনা মাছের ঝাঁকই হচ্ছে তাঁর গানের অজস্র ভাবের বিচিত্র মেলবন্ধনে এক প্রথাবিরোধী অতীব সত্যের উদ্‌ঘাটন। গৃহী আর গৃহহারা সকল বাউলও দেহসর্বস্ব সাধনায় নিমগ্ন। তাদের কথায় দেহ-ব্রহ্মাণ্ড কাজেই দেহশুদ্ধির কথা আসে, কেননা দেহের মধ্যেও তো আত্মার বসবাস। আর এ আত্মা প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা কলুষিত হয় তাই দেহকেই জাগতিক লোভ, মোহ ও আসক্তি থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারলেই আত্মার শুদ্ধি হবে। আত্মশুদ্ধির জন্য প্রয়োজন ইন্দ্রিয়ের দমন, প্রবৃত্তির ধ্বংস আর চিত্তশুদ্ধি; এ প্রক্রিয়া সহজে সম্ভব নয়। বলা যায় প্রধান দুই প্রকারে সাধকেরা তা অর্জন করেন—১. জ্ঞান মার্গীয়, ২. আচার মার্গীয়।[১] প্রথমত শুদ্ধ জ্ঞান অন্বেষণ করে, জিকির বা নাম-জপ করে। আচার মার্গীয় ধর্মসাধনা ক্রিয়াকেন্দ্রিক, কাজেই সাধককে কতকগুলি নীরবে নিভৃতে করতে হয় আবার কতকগুলি সুর্নির্দিষ্ট ক্রিয়ানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করতে হয়। এরূপ ধর্মসাধনা দুই প্রকার—যোগাচার ও বামাচার। শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত করে প্রাণায়ামাদি যোগ সাধনা দ্বারা সাধনার সিদ্ধি লাভ সম্ভব। আবার বামাচার সাধনা সকাম সাধনা—এখানে নারীর সংসর্গ সঙ্গম সাধনায় অঙ্গীভূত। তবে তা গুরুর নির্দেশে কিংবা গুরুর উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়। অবশ্য সকাম প্রেমের মূল লক্ষ্য নিষ্কামে উন্নীত করা। লক্ষ্য করলে দেখা যায় বাউল সাধনায় মিথুনাত্মক প্রেম থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে গুরুর প্রাধান্য।[২] তাই লালনের আকুতি, 'গুরু বিনে কি ধন আছে' কিংবা কখনো কামনা 'গুরু দোহাই তোমার, মনকে আমার লও গো সুপথে'; আবার নিজেকে গুরু-চরণে নিবেদন করতে চায়—'আমারে কি রাখবেন গুরু চরণদাসী' এরূপভাবে গুরুচরণস্মরণ, গুরুচরণাশ্রয়, গুরুভক্তির মধ্য দিয়ে গুরুর মাহাত্ম প্রচারিত হয়েছে। সেই দেহতত্ত্ব, আত্মতত্ত্বের মতো গুরুতত্ত্ব লালনের গানের একটি ভাব। দেহধারী মানুষ গুরুর দীক্ষানুযায়ী পরম মানুষে পরিণত হয়; তাই মানুষের মধ্যে মনের মানুষ কিংবা পরম মানুষকে অন্বেষণে সদা তারা ব্যস্ত। লালন এ মনের মানুষকে নানাবিধ অভিধায় অভিহিত করেছেন—'মানুষ রতন', 'অটল', 'অধর', 'অচিন পাখি', 'মনুরায়', 'আলেক সাঁই', 'অজান মানুষ', 'আলেক মানুষ' প্রভৃতি। দেহঘরের আত্মা, পরমাত্মার সাথে মিলিত হতে সদা বাউলের সাধনা। বৈষ্ণবধর্ম মতে জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলতে চায়। সুফিধর্মে ফানাফিল্লার মধ্য দিয়ে আত্মা ও পরমাত্মায় লীন হতে চায়। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির সীমা-অসীম এ যে মিলন পরিলক্ষিত হয় তা আত্মা-পরমাত্মার একটি রূপ; এটিকে রূপ-অরূপের মিলনতত্ত্ব বলা যায়। লালন দেহঘরে তল্লাশি করেছেন, তেমনি পরমাত্মাকে পাবার সকল বিষয় অবগত হয়েছেন, কিন্তু কোথায় জানি ত্রুটি রয়েছে। তাই তিনি গানে বলেছেন–'আমার ঘরের চাবি পরের হাতে'। দেহ বিশ্লেষণের পরে তিনি আপন আত্মাকে বিশ্লেষণে উল্লেখ করেছেন–'আপনারে আপনি চেনা যদি যায়' কিংবা 'আপনারে আপন চিনেছে যে জন'। সাধনার ধারাবাহিকতায় এক সময় উপলব্ধি হয়, তাই লালন গানে বলেছেন– 'বাড়ির কাছে এক পড়শী বসত

---

১. ওয়াকিল আহমদ, লালন গীতি সমগ্র, ঢাকা : বইপত্র, ২০০৫, পৃ. ১৯

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০।

করে/আমি একদিনও না দেখিলাম তারে'। কখনও তাঁর অনুভবে ধরা দেয় 'সে আর লালন একখানে রয়/ থাকে লক্ষ যোজন ফাঁক রে'। আত্মা ও পরমাত্মার দ্বৈত উপস্থিতি হলেও এক অভিন্ন সত্তা অদ্বৈত বিচরণ; যেমনটি লালনের অনুভবের কিনারায় এসেছে—'মেঘের বিদ্যুৎ মেঘে যেমন/ লুকালে না পায় অন্বেষণ' অথচ উৎসস্থল এক ও অভিন্ন। কিন্তু তাকে অন্বেষণে বিরামহীন লালনের নিবেদন 'যখন ও রূপ স্মরণ হয়। থাকে না লোক-লজ্জা ভয়/ অধীন লালন বলে সদায়/ প্রেম যে করে সেই জানে/' স্পষ্টত পরম মানুষ পেতে হলে এরূপ প্রেমই প্রয়োজন। অর্থাৎ আত্মা-পরমাত্মার এক সফল আত্মোপলব্ধি লালনের গানে বিরাজমান। কিন্তু পরামাত্মাকে পেতে হলে নিষ্ঠ প্রেম-ভক্তির মধ্য দিয়ে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে। পরমাত্মা ভাবের সাথে প্রেম-ভক্তি বিষয়ক ভাবের কথা আসে। লালনের গানের বিরাট অংশ জুড়ে প্রেমের কথা বলা হয়েছে। তবে লালনের বিশ্বাস সকাম প্রেমের মধ্য দিয়ে নিষ্কাম সাধনায় রত হওয়া যায়। প্রেম সম্বন্ধে তাঁর ব্যাখ্যা এরূপ—'কাম হইল প্রেমের লতা/ কাম ছাড়া প্রেম যথাতথা/ নাইরে আগমন'। কাম দিয়ে শুধু যৌন সম্ভোগ নয় বরং সংযত যৌনাচার কিংবা নিয়ন্ত্রিত কামই প্রেমের পরিপূরক। বাউল তথা লালন এরূপ প্রেমেরই পূজারী। এছাড়া প্রেমের সর্বোচ্চ পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে যেখানে 'জান্তে-মরা' হতে হয়; তিনি আরও উল্লেখ করেছেন এ প্রেম কিশোর-কিশোরী প্রেম নয় বরং এ ঔদার্য সম্পন্ন প্রেম তাই লালন বলেছেন, 'জেন্তে-মরা প্রেম-সাধন কি পারলি তোরা।/ যে প্রেমে কিশোর-কিশোরী হয়েছে হারা'।/ এরূপ প্রেম সুফি মতবাদে ইশক বলা হয়, বৈষ্ণব মতে 'ভগবৎপ্রেম'। লালন প্রেমের সঙ্গে ভক্তির যোগ উল্লেখ করেছেন 'ভক্তির জোরে জাল না দিলে। টান দিলে জাল উঠে খালি'। কাজেই প্রেম ও ভক্তি একটি এককসত্তা হিসেবে প্রেমতত্ত্বে স্থান নিয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের উল্লেখ রয়েছে লালনের গানে তেমনিভাবে আল্লাহ-রসুলের প্রেমের কথাও। অর্থাৎ প্রেম-ভক্তি লালনের ভাবজগতের অন্যতম একটি অধ্যায়ও বটে। কিন্তু এগুলো অর্জনে বাউলদের কঠোর নিয়ম-কানুন তো আছে তার সঙ্গে যোগ হয়েছে নিষ্ঠাময় সাধনা। সাধনা ছাড়া সকল কিছু মাটি; তাই সাধনাই বাউলদের ধর্ম-কর্মের মূল হাতিয়ার। বিচিত্র সাধনার বিচিত্র প্রক্রিয়ার নির্দেশনা গুরু হতে প্রদত্ত হয়।

বাউল ধর্মসাধনায় লতা সাধনা যন্ত্রসাধনা, ত্রয়ী নাড়ী সাধনা (বৌদ্ধমতে ললনা, কামনা, অবধূতী, ব্রাহ্মণমতে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না), ষষ্টচক্র ইত্যাদি।[৩] রূপক-প্রতীক-সংকেতের মধ্য দিয়ে সাধনার গুহ্য রহস্য নানাভাবে লালনের গানে ব্যক্ত হয়েছে।

সুতরাং আত্মা, পরমাত্মা, গুরু, প্রেম-ভক্তি ও সাধনা এই পাঁচটি মৌলিক তত্ত্বে লালনের গানের মূখ্য ভাবজগত নির্মিত হয়েছে।[৪] বাউল ভাবনায় এ পঞ্চ স্তম্ভ ভাবজগতের এক মজবুত ভিত্তি। এ বিষয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও সামাজিক ভাবমূলক গান, সুফি ও বৈষ্ণব ভাব মূলক গানও লালনের গানের ভাবজগতে রয়েছে। ভাবুক লালন ভাবজগতে বসে উপলব্ধি করেছেন 'ভাবে'র কথা। তাঁর ভাষায়—

> ভাবশূন্য হইলে হৃদয়
> বেদ পড়িলে কি ফল হয়
> ভাবের ভাবিক থাকলে সদায়
> গুপ্ত ব্যক্ত খবর সব জানা যাবে ॥[৫]

---

৩. বোরহান-উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর-সম্পাদিত, বাউল গান ও দুদ্দুশাহ, ঢাকা : বাঙলা একাডেমী, কার্তিক ১৩৭১, পৃ. ঠ

৪. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

৫. মুহম্মদ কামাল উদ্দীন সম্পাদিত, লালন গীতিকা, ঢাকা : মুক্তধারা, ৩য় সংস্ককরণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭, পৃ. ৫৩।

আবার তিনি ভাবের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক উল্লেখ করেছেন। তাঁর কথায় 'মনের ভাব প্রকাশিতে/ ভাষার উদয় এ জগতে'। তত্ত্ব দর্শনের সঙ্গে ভাব ভাষার চমৎকার মজদুরিও রয়েছে তাঁর গানে।

ভাষা

লোকসংগীতাঞ্চল বিভাজনে বাউলগান কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, ফদিরপুর, জামালপুর, এবং সিলেট জেলার প্রাধান্য বজায় রয়েছে।[৬] তবে বাউল গানের উৎপত্তি ভূমি হিসেবে কুষ্টিয়া-নদীয়া-যশোর উল্লেখযোগ্য।[৭] নদীয়ার অন্তর্গত কুষ্টিয়া লালনের জন্ম ও বাসস্থান হওয়ায় লালনের গানে মানসম্পন্ন খাঁটি বাংলা ভাষার রূপ পরিলক্ষিত হয়। তথাপি লালনের গানে আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব যথেষ্ট রয়েছে। ভাষাবিদ মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের মতে, লালনের গানে কুষ্টিয়ার অঞ্চলের উপভাষা বিদ্যমান।[৮] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও পদক্রম অনুসারে উপভাষাকে দুইভাগে বিভক্ত করেছেন। ক. পাশ্চাত্য, খ. প্রাচ্য। এ পাশ্চাত্য বিভাগটি আবার দুভাগে বিভক্ত। ১. উদীচ্য, ২. দক্ষিণ-পশ্চিম। দক্ষিণ-পশ্চিম এ বিভাগে তিনি কুষ্টিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৯] মানভাষা ও আধুনিক ভাষার মিশ্রণে এ স্বতন্ত্র উপভাষা তৈরি হয়েছে। রবীন্দ্র পূর্ববর্তী যুগে বিশেষ করে রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কালে এবং ভারতচন্দ্রের যাবনী মিশাল ভাষা ছাঁদকে অতিক্রম করে লালন নিজস্ব ভাষা নির্মাণ করতে পেরেছিলেন। যা এ বিষয়ে বিশেষ অভিনিবেশ দাবী করে। আমরা তাঁর গানগুলোকে বিশ্লেষণ করলে-ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বে নানা পরিবর্তন দেখতে পাব।

স্বরধ্বনিগত নানা বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন—

> মরি হায় কি লীলা কলিকালে
> বেদবিধি চমৎকারা।[১০]

অ> আ: চমৎকারা, এরূপ একজন > একজনা, অথই > অথাই, জন> জনা ইত্যাদি।

আবার, 'আ' 'অ' তে পরিণত হয়েছে। যেমন—

> শুদ্ধ প্রেমরাগে সদায় থাকরে আমার মন
> সোঁতে গা ঢালান দিও না বেয়ে যাও উজন।[১১]

উজান> উজন, (আ>অ) কিংবা–

> যে জানে উলট-মন্ত্র
> খাটায়ে সেই তন্ত্র
> গুরু-রূপ করে নজর
> বিষ ধরে সাধন করে।[১২]

উলটা-মন্ত্র> উলট মন্ত্র।

অনেকক্ষেত্রে আ, এ তে পরিণত হয়েছে—

> ভক্ত কবীর জেতে জোলা,

---

৬. হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশের লোকসংগীতে ভৌগোলিক পরিবেশ, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, জুন, ১৯৮২, পৃ.১১৯।

৭. ওয়াকিল আহমদ, বাংলা লোকসংগীতের ধারা, ঢাকা : ২০০৬, পৃ. ৩৮৪।

৮. শক্তিনাথ ঝা, ফকির লালন সাঁই : দেশ কাল এবং শিল্প, কলিকাতা : সংবাদ, ১৯৯৫, পৃ. ২৯০।

৯. ড. মুহম্মদ শহীদুলণ্ঢাহ, বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০ অক্টোবর, ১৯৯৯, পৃ. ৬২।

১০. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল ও বাউল গান, কলিকাতা : দীপান্বিতা, নতুন সংস্করণ, ১৩৮৮, পৃ. ৫৫৯।

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯৬।

১২. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৮।

প্রেম-ভক্তিতে মাতোয়ারা।[১৩]

এখানে জাত> জেতে,

স্বরধ্বনি 'ই' 'এ' তে পরিণত হয়েছে। যেমন—

সাঁই দরবেশ যারা

আপনাকে ফানা ক'রে

অধরে মেশে তারা।[১৪]

মিশে> মেশে, এরূপ ইসারাতে> এসারাতে প্রভৃতি।

স্বরধ্বনি 'এ' 'ই' তে পরিণত হয়েছে। যেমন—

কোন দিন সাধের পাখী যাবে উড়ে

ধুলো দিয়ে দুই চোখি।

চোখে > চোখি,

কখনো কখনো অ ই তে পরিণত হয়। এরূপ—

ফুলি > ফুল;

এছাড়া লালনের গানে ঈ, ঊ, ঐ, ঔ-এর ব্যবহার সবসময় নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে না।[১৫]

স্বরসঙ্গতিতে লালনের গানে বৈচিত্র্য এসেছে :

মনে বাঞ্ছা করি

দেখব তারি—

আমি কেমনে সে গাঁয় যাই রে ॥[১৬]

তারে (তারি), এরূপ আমারা (আমরা), আন্ধাকার (অন্ধকার) ইত্যাদি। স্বর-বিসঙ্গতিতে পাওয়া যায়—চুমকে (চমকে), বিচ্ছাদে (বিচ্ছেদে), অটাল (অটল)[১৭] ইত্যাদি।

স্বরাগমের ক্ষেত্রে—

অটল রূপের সরোবরে শ্রীরূপ

সে ঘাটের ঘেটেলা

যাও যদি মন সে শহরে

মায়ের চরণ ধর এই বেলা ॥[১৮]

ঘেটেল (ঘেটেলা), এরূপ সাদা (সদা), নুরু (নূর).[১৯]

আবার তাঁর গানে অপিনিহিতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

---

১৩. বাংলার বাউল ও বাউল গান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০৭।

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২৪।

১৫. ফকির লালন সাঁই : দেশ কাল এবং শিল্প, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯২।

১৬. বাংলা বাউল ও বাউল গান, অখণ্ড, পূর্বোক্ত,পৃ. ৫৭০।

১৭. ফকির লালন সাই : দেশ কাল এবং শিল্প, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯২।

১৮. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯.

১৯. ফকির লালন সাঁই : দেশ কাল এবং শিল্প, পূর্বোক্ত,পৃ. ২৯২.

Dhaka University Institutional Repository

সাধু না লইবে যারে
কে আর লইবে তারে
জানাও মহিমা
কর পাপ ক্ষমা
এই পাপীর হও সদয় ॥[২০]

লইবে (লবে), এরূপ চাইর (চার), জাইত (জাত), বইলে (বলে) আইজ (আজ) ইত্যাদি এবং অভিশ্রুতির ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন—লোয়ে, বেড়ে ইত্যাদি।[২১]

ব্যঞ্জনধ্বনির নানাবিধ পরিবর্তন লালনের গানে পাওয়া যায়। বৈচিত্র্যপূর্ণ ধ্বনি পরিবর্তনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো দেখতে পাই—

'ক' 'খ' এবং কখনো 'গ' ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যেমন—

জগৎ-জোড়া মীন সেই গাঙে
খেলছে খেলা পরম রঙ্গে,
লালন বলে জল শুখালে
মীন মিশিবে হাওয়ায়।[২২]

ক>খ, এরূপভাবে দিগে (দিকে), একদিগে।

অনেক সময় 'খ' ব্যঞ্জনধ্বনির মহাপ্রাণতা লোপ পেয়েছে। যেমন— দেখ> দেক, মুখ> মুক, নিরিখ> নিরিক। আবার—

(১) জ> চ, বিচ (বাজ)

(২) ঝ>জ, বুজি (বুজি), বোজাবে (বোঝাবে), মাঝার (মাজার)

(৩) ঠ>ট, কোঠা> (কোটা), কাট (কাঠ), উটাল (উঠিল)।

(৪) থ>দ, সুপদ (সুপথ), পত (পথ), কতার (কথার), প্রতম (প্রথম)

(৫) দ> ড,ডন্ডে (দণ্ডে), ডংশায় (দংশায়), খুদা (ক্ষুধা), সুদা (সুধা), আদার (আঁধার)

(৬) এরূপভাবে প>ব- দিব (দীপ), প্রতিবাদে (প্রতিপদে)

(৭) ম> ব, নাবাই (নামাই), নেবে (নেমে)

(৮) ব>প, ফ-ডোফ (ডোব)

(৯) ফ>প, ব-নাব (লাফ), সাপল (সফল)

(১০) ভ>ব- শোব (শোভা), লোব (লোভ) ইত্যাতি।[২৩]

---

২০. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত,পৃ. ৩৪৮.

২১. ফকির লালন সাঁই : দেশ কাল এবং শিল্প, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯২.

২২. বাংলার বাউল ও বাউল গান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১০.

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯২-২৯৩.

অনেক ক্ষেত্রে যুক্তব্যঞ্জন দ্ধ, 'দ্দ' পরিণত হয়েছে। যেমন—সিদ্ধি >সিদ্দি সমীভবন প্রক্রিয়ায় সাধারণত উচ্চারণের সুবিধার্থে এরূপ হয়েছে যেমন—আদ্য> আর্দ্দ ইত্যাদি। অনুরূপভাবে বিষমীভবনের দৃষ্টান্ত রয়েছে—

একই কোরান পড়াশুনা

কেউ মোলবি কেউ মওলানা

দাহিরে হয় কত জনা

সে মানে না শরার কাজী।[২৪]

অল্পপ্রাণ ও অঘোষধ্বনি মহাপ্রাণ ও ঘোষধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যেমন—

থাকে ভেস্তের আশায় মমিনগণ

হিন্দুরা দেয় স্বর্গেতে মন-[২৫]

আবার ব্যঞ্জনধ্বনির মহাপ্রাণতা হারিয়ে অঘোষধ্বনিতে পরিণত হয়েছে যেমন—

আছে আদ মক্কা এই মানুষ দেহেঃ ।

দেখনা না রে মন ভেয়েঃ।[২৬]

এছাড়াও কুষ্টিয়া অঞ্চলের উপভাষায় স্বভাবতই পূর্ণ আনুনাসিক্যভবন তার উদাহরণ রয়েছে। লালনের গান-

চাঁদ বদনে বল গো সাঁই।

বান্দার এক দমের ভরসা নাই ॥[২৭]

চাঁদ (চাদ) এরূপ, আঁধার> আঁদার (আদার) তারপরেও বিনানাসিক্যভবনের পরিচয় রয়েছে। যেমন—চাদ, আদার ইত্যাদি। লালনের গানে এরূপ দৃষ্টান্ত—

শোরিয়ত আর মারফত আদায়ে,

নবীর আএনে এই দুই হুকুম সদায়ে,

নজর একদিগ জায়ে আর দিগ আদার হএ

দুইরূপ কিরূপ ঠিক করি ॥[২৮]

রূপতত্ত্ব

বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের যে রূপপরিবর্তন ঘটে তা ভাষাবিজ্ঞানে রূপতত্ত্ব শাখায় আলোচিত হয়।[২৯] লালনের গানে বিচিত্র শব্দের বৈচিত্র্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়। তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব এবং আঞ্চলিক শব্দের সঙ্গে আরবি, ফারসি, ইংরেজি ও পর্তুগীজ শব্দের মিশ্র ব্যবহার দেখা যায়। তিনি অনায়াসে আঞ্চলিক শব্দের সঙ্গে বিদেশি শব্দের মিশ্রণ ঘটিয়ে শব্দ-চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতে পেরেছেন। বস্তুত লোকায়ত জীবনের উপাদানের সঙ্গে শিষ্ট ভাষার শব্দকেও আত্মীকরণের মধ্য দিয়ে লালন-

---

২৪. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৫.

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৫.

২৬. ফকির লালন সাঁই : দেশ কাল এবং শিল্প, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

২৭. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭.

২৮. ফকির লালন সাঁই : দেশ কাল এবং শিল্প, পূর্বোক্ত পৃ.৪.

২৯. ড. রামেশ্বর শ, সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, কলকাতা : পুস্তক বিপণী, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৩, পৃ. ৪০৩

কাব্যভাষা নির্মিত হয়েছে। সাধুরীতি ও চলিতরীতি মিশ্রিত হয়ে উপভোগ্য হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ লালনের এ গুরুচণ্ডালীর জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। অবশ্য তাঁর গানের শব্দ ভাণ্ডারে তদ্ভব, অর্ধতৎসম ও আঞ্চলিক শব্দের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া প্রত্যয়, প্রকৃতি, বিভক্তি, সমাস, সন্ধি, কারক প্রভৃতি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি পেয়েছে।

লালনের গানে বিশেষ বিশেষ প্রত্যয়, বিভক্তি ও উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—অজান, নিওম, নি-আকার, বেহাল, বেমতি, অপরি, অবধারি, অনিরূপ ইত্যাদি।[৩০]

সাধারণত উপভাষায় সমাস কিংবা সন্ধির ব্যবহার খুব একটা বেশি না হলেও লালন দক্ষ কারিগরের মত এগুলো প্রয়োগ করেছেন। যেমন—

কোন দিন শ্মশানবাসী হব,
কি ধন সঙ্গে লয়ে যাব হে।[৩১]

আবার,

নিষ্কামী নির্বিকার হলে
জীয়ন্তে মরে যোগ সাধিলে,
তবে খাতায় ওয়াশিল পাবে,
নইলে উপায় কই দেখি।[৩২]

এরূপ নির্বিকার, দেশান্তরি, মন-কাণ্ডারি, দেলমক্কা, নিরাকার, ধর্মাধর্ম, প্রভৃতি সন্ধিবদ্ধ শব্দের ব্যবহার হয়েছে।

লালনের গানে কারক বাচক অনুসর্গ 'বিনা' ব্যবহারে ভাষায় বৈচিত্র্য এসেছে। যেমন—

'শুদ্ধ প্রেম রসিক বিনে কে তারে পায়',
'গুরু বিনে কি ধন আর আছেরে',
'অনুরাগ বিনে কি সাধন হয়',
'বিনে হাওয়ায় মৌজা ছোটে'। ইত্যাদি

লালনের গানের ভাষায় বিভক্তির যথেষ্ট ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন— এ/ তে বিভক্তির বৈচিত্র্যমণ্ডিত রূপ—

আছে ভাবের সেই ঘরে,
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়,
যে স্মরণে যাবে জীব যন্ত্রণা। ইত্যাদি।

করণকারকে এবং অধিকরণ কারকে এ/ তে বিভক্তি যথেষ্ট দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন—

'কি সাধনে আমি পাই গো তারে'
'গুরুপদে ডুবে থাকরে আমার মন'
আলেকে আলেক মানুষ রয়' ইত্যাদি।

---

৩০. তপন কুমার বিশ্বাস, লোককবি লালন, কলকাতা : পুস্তক বিপণী, ২০০০, পৃ. ৯৯.

৩১. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত,পৃ. ১২৯.

৩২. পূর্বোক্ত,পৃ. ১৩০.

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও 'কে' এর পরিবর্তে 'রে' বিভক্তি এবং 'র' এর পরিবর্তে 'ক' বিভক্তি ও লালনের গানে পাওয়া যায়।[৩৩]

আবার কথ্য উপভাষায় সমাসের ব্যবহার সীমিত হলেও লালনের গানে এর আরও দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন—আজকাল, সুধানিধি, লাভলোকসান, দিবানিশি, সুধাসিন্ধু, আশাসিন্ধু, হাওয়াখানা, আয়নামহল, দেলদরিয়া, মুক্তিদাতা, প্রেমরত্ন ইত্যাদি।

এছাড়াও লিঙ্গসচেতনামূলক শব্দ ব্যবহারেও লালনের কৃতিত্ব রয়েছে এবং এ ব্যাপারে তাঁর গানেও উল্লেখ রয়েছে। তাঁর ভাষায়—

স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ আর
নপুংসক শাসিত কর
আছে যে লিঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডের উপর
কর প্রকাশি॥[৩৪]

তাই তাঁর গানে ভুঙ্গনা, নিরঞ্জনা, রাক্ষসী, আড়চোখী ইত্যাদি স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ পাওয়া যায়। আবার লালনের গানে আরবি-ফারসি শব্দের এবং ইংরেজি শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার দেখতে পাই। বেশিরভাগ ইংরেজি শব্দগুলো তার নিজস্ব ঢঙ্গে গানে পাওয়া যায়। যেমন— বেরাদর (ব্রাদার), ম্যাজিস্টারি (ম্যাজিস্ট্রেট), পক্সো (পক্স) ইত্যাদি। তাঁর গানে ইসলামী ভাবধারা ও মর্যাদার জন্য যেমন আরবি, ফারসি ভাষা এসেছে তেমনি হিন্দু ঐতিহ্যে যুক্ত হয়েছে তৎসম, তদ্ভব শব্দ।[৩৫] তিনি নিজেও যে বিদেশী ভাষা ব্যবহারে সচেতন ছিলেন তা তাঁর ভাষায় উপলব্ধি করা যায়—

'আরবী ভাষায় বলে আল্লা,
ফারসীতে কয় খোদাতা'লা,
গড্ বলিছে যীশুর চ্যালা,
ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভাবে'।[৩৬]

বিশিষ্ট ভাষাবিদ মুহম্মদ আবদুল হাই এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—

> 'আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার, কোরানের জ্ঞান এবং হিন্দু পুরাণের যথেচ্ছ প্রয়োগ সক্ষমতা দেখলে বিস্মিত হ'তে হয় এবং তখন তিনি যে নিরক্ষর ছিলেন একথা বিশ্বাস হয় না'।[৩৭]

লালন শাহের গানে পরিভাষার ব্যবহার যথেষ্ট হয়েছে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সহ আর অনেকে একে 'আলো-আঁধারি', 'সন্ধ্যা ভাষা' হিসেবে অভিহিত করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য :

> "গানে এমন অনেক আলো-আঁধারি ভাষা আছে, যা তাঁদের সম্প্রদায়ের বাইরে কারও বোঝা অতি কঠিন। কতক ভাব আছে-যার উৎস হিন্দু ধর্ম, আর কতক ভাব আছে, যার উৎস ইসলাম। আর কতক আছে তাঁদের নিজস্ব। এর কতকগুলি গান দেহতত্ত্ব বিষয়ক। বৌদ্ধদের সহজসিদ্ধি হতে বোধ হয় এগুলি লওয়া"।[৩৮]

---

৩৩. ফকির লালন সাই : দেশ কাল এবং শিল্প, পূর্বোক্ত,পৃ. ২৯৮.

৩৪. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৫-৩২৬.

৩৫. লোককবি লালন, পূর্বোক্ত,পৃ. ১১৪.

৩৬. মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সম্পাদিত হারামণি ৭ম খণ্ড, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, মার্চ, ১৯৭৮, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৯.

৩৭. হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী, ১ম খণ্ড, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ. ৪৩১.

৩৮. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুলণ্ঢাহ, লালন শাহের কাব্যে আত্মনিবেদনের সুর, আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত লালন স্মারকগ্রন্থ, ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, মার্চ ১৯৭৪, পৃ. ৫৬.

সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে ডক্টর ওয়াকিল আহমদ নিম্নোক্ত পরিভাষাগুলোর পরিচয় দিয়েছেন :[৩৯]

ক. **সংখ্যাশ্রিত :** দ্বি-দল, যুগলরূপ, চারিচন্দ্র, চাররং, পাঞ্জাতন, ছয় মোকাম, ছয় লতিফা, ছয় বোম্বেটে, আটকুঠুরি, নয় দরজা, দশম দ্বার, দমশ দশা, চৌদ্দভুবন, লক্ষ যোজন ইত্যাদি। লালনের গানে এরূপ পরিভাষার দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ :

হায়! গুরু ভজবো বলে আশা ছিল
কাল-শমনে ঘিরে নিল,
দিনে দিনে দিন ফুরাইল,
ও আমার আসল বস্তু লুটে নিল
বোম্বেটে ছয় জনা॥[৪০]

এখানে 'ছয়জনা বোম্বেটে' কিংবা 'ছয় বোম্বেটে' বলতে ছয় রিপুকে বলা হয়েছে। 'কাম', 'ক্রোধ', 'লোভ', 'মোহ', 'মেদ', 'মাৎসর্য' এই দুষ্টচক্রের কারণেই প্রকৃতভাবে গুরুকর্ম সম্পন্ন করা যায় না। ফকির লালন অত্যন্ত নিরূপায় হয়ে অকপটে তাঁর ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেছেন। এরূপ পরিভাষাগত শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তিনি যেমন সাধন-জগতের প্রতিকূলতার কথা বলেছেন তেমনি ভাষার ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতার কথা স্মরণ করতে হয়।

আট কুঠুরি **নয় দরজা** আটা
মধ্যে মধ্যে ঝরকা কাটা
তার উপরে সদর কোঠা
আয়না-মহল তায় ॥[৪১]

লালন দেহতত্ত্বে 'নয় দরজা'র উল্লেখ করেছেন। দেহকে বাহ্যিকভাবে বিশ্লেষণ করলে নয়টি দরজাই পাওয়া যায়।' যেমন— ২ চক্ষু, ২ কর্ণ, ২ নাসারন্ধ্র, ১ মুখ, ১ পায়ু (মলদ্বার), ১ উপস্থ (লিঙ্গ, যোনী)। লালন যেমন দেহ জরিপ করেছেন তেমনি দেহ ব্যবচ্ছেদ করে এর নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিভবে সাধন জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত তারও ব্যাখ্যা তিনি করেছেন। তাই 'নয় দরজা' তাঁরই উদ্ভাবিত একটি নিজস্ব পরিভাষা।

খ. **যোগাশ্রিত :** শ্বাস-প্রশ্বাস, পিঙ্গলা-সুষুম্মা, নীর-ক্ষীর, গঙ্গা-যমুনা-স্বরস্বতী, ত্রিবেণী, রাগের ঘর, রাগের কিরণ, পূরক-রেচক-কুম্ভক, স্থূল-প্রবৃত্তি-সাধক-সিদ্ধ, জোয়ার-ভাটা, ইল্লিন-সিজ্জিন , উজান বাঁকে, আগম-নিগম, কামরূপ ঘাট, মনিপুর, জবরত-নাসুত-মালাকুত-হাহুত ইত্যাদি। এরূপ দৃষ্টান্ত যেমন—

খেলছে মানুষ **নীরে ক্ষীরে**
আপন আপন ঘর
বোঝ মন আমার
কেন হেতড়ে বেড়াও কোলের ঘোরে॥[৪২]

যোগ-সাধনায় লালন নানাবিধ পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। এরূপ 'নীর ক্ষীর' শব্দটি তিনি রজঃ এবং বীর্যের প্রতীকার্থে ব্যবহার করেছেন। পুরুষ প্রকৃতি এ দু'টোর অবিরাম খেলা চলে আপন দেহেও।

৩৯. বাংলা লোকসংগীতের ধারা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৫
৪০. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২
৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫
৪২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭২

Dhaka University Institutional Repository

কেননা সাধন জগতে কেউ আর পুরুষ থাকে না, সকলেই নারীত্ব গ্রহণে বাধ্য আর স্বয়ং 'সেই' একমাত্র পুরুষ। তাই সাধকের একই দেহে দুই রূপ বিদ্যমান।

ত্রিবেণীর পিছন ঘাটে
বিনে হাওয়ায় মৌজা ছোটে
ও সে বোবায় কথা কয়
কালায় শুনতে পায়
আন্ধেলাতে পরখ করছে সোনা॥[৪৩]

'ত্রিবেণী' মানবদেহের মেরুদণ্ডের বামে 'ইড়া', ডানে 'পিঙ্গলা' এবং মধ্যভাগে 'সুষুম্না' নাড়ি অবস্থিত। তন্ত্রশাস্ত্রে এগুলোকে যথাক্রমে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী বলে। যৌনাঙ্গের নিকট মূলাধারে এই তিনটি নাড়ী মিলিত হয়। এই মিলনকে 'ত্রিবেণী' বলা হয়। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে প্রতি মাসে প্রকৃতির যে রজঃস্রাব হয় তাকে বাউলেরা ত্রিবেণীর ত্রিধারা বিশিষ্ট নদীপ্রবাহ বলে অভিহিত করেছেন। আর এই নদীপ্রবাহে 'অধর মানুষ' 'মীন' রূপে আবির্ভূত হয়। প্রকৃত সাধকজনা এ ঘাটে বসেই 'অধর মানুষ'কে ধরে।[৪৪] লালন 'ত্রিবেণী' পরিভাষাটিতে এর স্বরূপ বর্ণনা করেছেন এবং যথার্থ সাধককে জহুরীর মত সোনা পরীক্ষা করে সাধনায় উপনীত হতে হবে বলে উপদেশ দিয়েছেন।

গ. **প্রতীকাশ্রিত :** অচিন পাখি, আরশিনগর, সহজ মানুষ, মনের মানুষ, অরূপ রতন, কল্পতরু, আনন্দ বাজার, মন-মাঝি, মনুরায়, আজবফুল, মেঘনা নদী, বৈদিক মেঘ, ঠক বাজার ইত্যাদি। নিম্নে এরূপ দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হলো :

খাঁচার ভিতর **অচিন পাখি** কেমনে আসে যায়?
ধরতে পারলে মন-বেড়ী দিতাম তাহার পায়॥[৪৫]

'অচিন পাখি' পরমাত্মার প্রতীক। আর 'খাঁচা' মানবদেহের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষত গুহ্য সাধনায় এরূপ প্রতীকের ব্যবহার অনিবার্য। ফকির লালনও এরূপ পরিভাষাগত শব্দ চয়নের মধ্য দিয়ে তাঁর ভাবকে প্রকাশিত করেছেন।

কার বা আমি, কেবা আমার
প্রাপ্ত বস্তু ঠিক নাই তার,
বৈদিক মেঘে ঘোর অন্ধকার
উদয় হয়না দিন মণি॥[৪৬]

লালন ফকির 'বৈদিক মেঘ' অর্থাৎ বেদোক্ত নানা বিধি-নিষেধ, আচার-অনুষ্ঠানের কড়াকড়িকে মোটেই প্রশ্রয় দেননি। লেবাসী ধর্ম পালনের চাইতে নীরবতাই তাঁর কাছে শ্রেয়। কিন্তু জগৎ-সংসারে এরূপ ধর্ম-কর্মের বাড়াবাড়িতে মানুষের মন যেন সদা ব্যস্ত। অথচ বেদের চেয়ে 'মানুষ' আরও বড় সত্য তার খবর হয়ত আমরা রাখি না। তাঁর যথার্থ প্রত্যাশা এ সবের চেয়ে মানুষ ভজন-সাধনাই প্রকৃত ধর্মের কাজ। অথচ বেদ, বিধি, শাস্ত্র নিয়ে আমরা আসল ধর্ম চর্চার প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে চলছি।

ঘ. **ভাবাশ্রিত :** হৃদ-মাঝার, দয়াল গুরু, চেতন গুরু, ভাবের কাণ্ডারি, রসের ভিয়ান, শুদ্ধ প্রেম, নেহাল করে, বেহাল হওয়া ইত্যাদি। এরূপ পরিভাষা যেমন—

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯১
৪৪. বাংলার বাউল ও বাউল গান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৩
৪৫. লালন গীতি সমগ্র, পৃ. ১৩৫
৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭

করি কেমনে **শুদ্ধ সহজ প্রেম** সাধন।

প্রেম সাধিতে ফেঁপে ওঠে কাম-নদীর তুফান॥[৪৭]

বাউল সাধনায় কামকে বিষধর সাপের সঙ্গে খেলার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। প্রকৃত ওঝা যেমন তাকে বশ করে তার ক্রিয়াকর্ম চালায় তেমনি 'শুদ্ধ প্রেম' সাধনায় কামকে নিয়ন্ত্রিত করে কর্মের দেশ নির্মাণ করতে হবে। তাই লালন ব্যবহৃত 'শুদ্ধপ্রেম' পরিভাষাটি একটি বিরাট ভাবের প্রকাশ করেছে, যা সাধকের ভাবনার জগতকে সমৃদ্ধ করেছে।

কোথা আছে রে দীন দরদী সাঁই?

চেতন-গুরুর সঙ্গ লয়ে খবর কর ভাই॥[৪৮]

লালন শাহ এখানে 'চেতন-গুরু'র কথা উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ যিনি নিজে সদা জাগ্রত অর্থাৎ যিনি পরিপূর্ণ জগতের খবর রাখতে পারেন কেবল সেই গুরুর চরণাশ্রয় হলে শিষ্য সঠিক জ্ঞান পেতে পারেন। এরূপ পরিভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে লালনের ভাষা প্রয়োগে যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় মেলে।

এছাড়াও তিনরতি, ত্রিধারা, পঞ্চতত্ত্ব, সাড়ে নয় দরজা, চৌদ্দ পোয়া, ষোলকলা, ষোলজন বোম্বাটে, আঠার মোকাম, চব্বিশপক্ষ, বায়ান্ন বাজার, তেপান্ন গলি প্রভৃতি সংখ্যাশ্রিত পরিভাষার শব্দসমূহ।

বারামখানা, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, পূর্ণশশী, পূর্ণমাসী, হাওয়া-কল, হাওয়ার ফাঁদ ইত্যাদি যোগাশ্রিত পরিভাষার শব্দবলয়।

সদরকোঠা, দশদুয়ারী, মানুষ-মক্কা, মন-বেড়ী, শ্রীচরণ, পতিত পাবন, রংমহল, আলেকশহর ইত্যাদি প্রতীকাশ্রিত পরিভাষা। এবং ভাবাশ্রিত পরিভাষার মধ্যে রয়েছে—আন্দেলা, ভাবের তালা, ভাবের বাড়ি, হৃদ-কমল, কমল কোটা ইত্যাদি শব্দসমূহ।

লালনের গানে তদ্ভব, তৎসম, দেশি-বিদেশি, রূপক এবং তত্ত্বপ্রধান বহু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ করে শব্দ-মটিফিম ও বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করে তাঁর কবিত্ব, লালন সাহিত্যের মেজাজ, প্রতিফলিত সমাজচিত্র এমনকি তাঁর মত ও পথ সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়।[৪৯] এ বিষয়ে চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বাক্যতত্ত্ব

বাক্যের মধ্যে শব্দগুলোর বিন্যাস এবং পারস্পরিক সম্পর্ক বাক্যতত্ত্বের বিষয়। লালনের গানে বাক্যতত্ত্ব (Syntax) এর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সাধু, চলিত ও কথ্য বা আঞ্চলিক এ ত্রিরূপের ক্রিয়াপদ তাঁর গানে পাওয়া যায়। যেমন— কৈরে, করে, করিও, করিয়া। অনুরূপভাবে সর্বনামের তিন রূপ যেমন—আমা, আমাকে, মোকে, মোরে ইত্যাদি।[৫০] লালনের গানে বাক্যগুলো প্রায় গদ্যধর্মী। যেমন—

আমারে কি রাখবেন গুরু চরণদাসী ?

ইতরপনা কার্য আমার অহর্নিশি ॥

---

৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৬

48. c~‡e©v³, c„. 191

৪৯. ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, লোকসাহিত্য ২য় খণ্ড, ঢাকা : গতিধারা, পরিমার্জিত সংস্করণ, জুলাই ১৯৯৫, পৃ. ১২৪।

৫০. লোককবি লালন, c~‡e©v³, পৃ. ১০১-১০২.

কিছু কাব্যিক শব্দ রয়েছে যেমন—যেমতি, যেমত, তেমতি, মোরে ইত্যাদি ব্যবহারে বাক্য ব্যঞ্জনাময় ও বুদ্ধিদীপ্ত হয়ে উঠেছে। এরূপ—

যন্ত্রেতে যন্ত্রী যেমন
যেমত বাজায় বাজে তেমন
তেমনি যন্ত্র আমার মন
বোল তোমার হালে ॥[৫১]

এছাড়াও প্রচলিত ইঙ্গিতধর্মী প্রবাদ-প্রবচন তাঁর বক্তব্যকে যেমন দৃঢ় করেছে তেমনি সংশ্লিষ্ট বাক্যগুলিতে বাহুল্য বর্জিত হয়েছে। যেমন—

গুরুবস্তু চিনলি নে মন
অসময়ে কি করবি তখন,
বিনয় করে বলছে লালন
যজ্ঞের ঘৃত কুত্তায় খেল রে ॥[৫২]

এমনিভাবে, 'কাক মারিতে কামান পাতা', 'সুঁই ছিদ্রে চালায় হাতি', 'পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর' ইত্যাদি প্রবাদ-প্রবচনের দৃষ্টান্ত রয়েছে।

এছাড়াও শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কারসহ বাক্যান্তে ছন্দের মিলের ফলে বাক্য ব্যবহারে লালনের গানগুলো আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে পরবর্তী অধ্যায়ে। সুতরাং ভাবের সঙ্গে উপযোগী ভাষা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে লালনের গানে যে জ্ঞানের দীপ্তি জ্বলেছে তার প্রতি লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিস্ময়ের সঙ্গে যথার্থই উল্লেখ করেছেন :

> 'ভাষার সরলতায় ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না, তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব তেমনি কাব্যরচনা, তেমনি ভক্তির রস মিশেচে। লোক সাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় ব'লে বিশ্বাস করিনে'।[৫৩]

ভাব, ভাষা ছাড়াও একটি সুশৃঙ্খল আঙ্গিক কাঠামো দৃষ্ট হয়।[৫৪]

আঙ্গিক কাঠামো

বাংলাদেশের জনগণ ভাবপ্রবণ, এ ভাবপ্রবণতা থেকেই বাঙালির গীতিকবিতার উদ্ভব।[৫৫] বাংলা গান রাগ-প্রধান নয় বরং বাণী প্রধান তাই এ গান গীতিকবিতা হিসেবে সুখপাঠ্য। চর্যাপদ, বৈষ্ণবপদ, সুফিপদ, শক্তিপদ, কীর্তন, কবিওয়ালা গান গীতিরসে পূর্ণ; আর লালন-গীতি তথা বাউলগানের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

অবয়বের দৃষ্টিতে বাংলা গান চারটি তুক বা অংশে বিভক্ত। যেমন—'ক'. আস্থায়ী বা ধুয়া, খ. অন্তরা, গ. সঞ্চারী, ঘ. আভোগ। ধুয়ায় মূলভাবের শুরু, অন্তরায় তার বিবরণ, সঞ্চারীতে বিকাশ এবং আভোগে পরিসমাপ্তি। আধুনিক গানে ভণিতা না থাকলেও বাউল গানে ঐতিহ্যগতভাবে ভণিতার

---

৫১. লালন গীতি সমগ্র, c~‡e©v³, পৃ.১৯৩
৫২. c~‡e©v³, পৃ. ৯৪
৫৩. মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, হারামণি, ৫ম খ', ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪, পৃ. আশির্বাদ, -খ
৫৪. লালন গীতি সমগ্র, c~‡e©v³, পৃ. ৫৬
৫৫. আহমদ শরীফ, বাউল তত্ত্ব, ঢাকা : বাঙলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩, পৃ. ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহার রয়েছে। সাধারণত আভোগের শেষ দুই চরণের কোন একটিতে লালন ভণিতা ব্যবহার করেন। তাঁর গানে এটাই মূল আঙ্গিকগত কাঠামো। এছাড়াও তাঁর গানগুলো সংক্ষিপ্ত। সাড়ে তিন, সাড়ে চার কলিতে অধিকাংশ পদ রচিত। প্রথম কলি ও দুটি ছোট চরণের সমাহার। এর ফলে পাঁচটি ছেদ তাঁর গানের কাঠামোতে পাওয়া যায়। চর্যার পরবর্তীতে প্রায় সব বাউল গানে এ ঐতিহ্য বজায় রয়েছে। লালনের গানে লক্ষ্য করলে দেখা যায় খুব কম সংখ্যক গান আছে যেখানে তিনের অধিক স্তবক সন্নিবেশিত হয়েছে।[৫৬] ছন্দের ক্ষেত্রেও অন্ত্যমিল এবং অন্তর্মিলের প্রতি তাঁর একটা সহজাত আকর্ষণ রয়েছে। তাঁর গানে ধুয়ায় যে ধ্বনি বা অন্ত্যানুপ্রাস দিয়ে জোড়পদ রচনা হয়েছে, অন্তরাদির স্তবকের শেষ রচনাটিতে সেই ধ্বনি থাকে। ফলে ধুয়াটি পুনরায় গীত হয়। স্তবকের প্রতিটি জোড় চরণে এমনকি ত্রয়ী চরণেও মিল দেখা যায়। যা ছন্দের পরিভাষায় খখক, খখখক বলা যায়। লালনের গানে এরূপভাবে ছন্দরীতি ও সুর কাঠামো সতর্কতার সাথে রচিত হয়েছে। তাঁর গানে 'বাউল ছন্দ', 'নৃত্যছন্দে'র দৃষ্টান্ত রয়েছে। কারণ, বাউল আসরে গানের সাথে নাচও পরিবেশিত হয়। গায়ক বাউল দেহ দুলিয়ে ছোট ছোট পদ সঞ্চালনে নৃত্য করেন। এটা লালনের গানের এক প্রিয় আঙ্গিক। নৃত্যছন্দ বিষয়ে চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তবে ছন্দরীতিসহ অন্যান্য আঙ্গিক বিষয়ের সঙ্গে সুর-কাঠামো তাৎপর্যপূর্ণ। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য স্মরণযোগ্য—

> "আমাদের বাউলের সুরগুলি আলোচনা ক'রে দেখি তবে দেখতে পাব যে, তাতে আমাদের সঙ্গীতের মূল আদর্শটাও বজায় আছে অথচ সেই সুরগুলা স্বাধীন। ক্ষণে ক্ষণে এ-রাগিণী ও-রাগিণীর আভাস পাই কিন্তু ধরতে পারা যায় না। অনেক কীর্ত্তন ও বাউলের সুর বৈঠকী গানের একেবারে গা ঘেঁষে গিয়েও তাকে স্পর্শ করে না। ওস্তাদের আইন অনুসারে এটা অপরাধ। কিন্তু বাউলের সুর যে একঘ'রে, রাগরাগিণী যতই চোখ রাঙাক্ সে কিসের কেয়ার করে! এই সুরগুলিকে কোন রাগ-কৌলীন্যের জাতের কোঠায় ফেলা যায় না বটে তবুও এদের জাতির পরিচয় সম্বন্ধে ভুল হয় না—স্পষ্ট বোঝা যায় এ আমাদের দেশেরই সুর, বিলিতি সুর নয়।"[৫৭]

বাউল সুর নিজেকে কিভাবে অধিকার করেছিল সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ হারামণির আশীর্বাদ পর্বে এভাবে উল্লেখ করেছেন :

> "আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিলন ঘটেচে। এর থেকে বুঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন্ এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হ'য়ে মিশে গেছে।"[৫৮]

শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, দ্রোহের কবি নজরুল ইসলামের গানেও বাউল সুর স্থান গ্রহণ করেছে। ড. মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর 'A History of Sufi-ism in Bengal' গ্রন্থে মুর্শিদা গান, দেহতত্ত্ব গান এবং বাউল গানকে অভিন্ন বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৯] তিনি মূল বিষয়বস্তুর উপর লক্ষ্য রেখে এরূপ মন্তব্য করলেও এ গানগুলোর সুরের ক্ষেত্রেও খুব একটা পার্থক্য নেই। ড. আহমদ শরীফ বাউলতত্ত্ব আলোচনায় উল্লেখ করেছেন—

> "সাহিত্য হিসেবে বিচার করলে বাউল গান লালিত্য বিরল লোকগীতি মাত্র। আর কিছু নয়। সুরের একঘেয়েমিও তত্ত্ব-বিমুখ শ্রোতার পক্ষে পীড়াদায়ক। বাউল গানের কদর আছে ভাবুক ও তত্ত্ব-প্রিয় লোকের কাছে এবং তা গান হিসেবে নয়—তত্ত্বকথার আশ্রয় হিসেবে।"[৬০]

---

৫৬. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬.

৫৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছন্দ, কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থ প্রকাশ বিভাগ, আষাঢ়, ১৩৪৩, পৃ. ১৮৪.

৫৮. মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, হারামণি, ১ম খণ্ড, কলিকাতা : বৈশাখ, ১৩৩৭, পৃ. আশীর্ব্বাদ

৫৯. Muhamad Enamul Haq, A History of Sufi-ism in Bengal, Asiatic Society of Bangladesh, Dacca-30 April, 1975, p.302.

৬০. বাউল তত্ত্ব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯.

লালন গবেষক শক্তিনাথ ঝা উল্লেখ করেছেন—

"লালনের গানে পদাত্মক বিবৃতি সূচনা তালে ফেলে কলির গান, শেষাংশ দ্রুত সুরে সমাপ্তি চিহ্নিত করা হয়েছে।"[৬১]

লালনপন্থী শিল্পী মকছেদ আলী সাঁই লালনের গানের সুর সম্বন্ধে বলেছেন—

"গীতিকবিতার সুরে বিরহী প্রেমিক প্রেমিকার বিচ্ছেদ-প্রদাহ লালনের গানে গোচরীভূত হয়।"...[৬২]

মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী উল্লেখ করেছেন—

"বাউল গানের সুনির্দিষ্ট কোন সুর নেই। কোন কোন গানের ছায়া অনুসৃত হলেও সারি-ভাটিয়ালী সুর অবলম্বনেই বাউল গান রচিত। এখানে কথার চেয়ে সুরের সাযুজ্যই বেশি।"[৬৩]

সুধাংশু শেখর শাসমল বলেছেন—

"বাউলদের প্রচলিত সাত সুরের সম্পর্ক দেখা যায়। ফিকির চাঁদ বা ক্ষ্যাপা বাউলের (লালন শিষ্য কাঙাল হরিনাথ) সুরের কাঠামো হলো : স স স র, গ ধ ন, ধ স, র্স, ন ধ প, প ম গ, গ র, র স ম, গ র স। ঝিঁঝিট অপেক্ষা বিলাবল এর রাগরূপ এতে বেশি প্রতিফলিত। ভাটিয়ালী চড়া সুরের গান। কিন্তু বাউল বা কীর্তন গানের সঙ্গে সামান্য নাচের সম্পর্ক থাকায় এই সুরকে মধ্য সপ্তকে বা পূর্বাঙ্গে রাখতে হয়।"[৬৪]

মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী ভাটিয়ালী সুরের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলেছেন—

"ভাটিয়ালী সুরে যে স্বরের প্রয়োগ হয় তা রাগসঙ্গীতের খাম্বাজ ও পিলু সুরের সমগোত্রীয়। কখনও কখনও ভীমপলশ্রী, পটদীপ রাগের সঙ্গেও এর মিল লক্ষ্য করা যায়, ঠাট প্রকরণ বিচার করলে খাম্বাজ এবং কাফী এই দুইটি ঠাটের সঙ্গে ভাটিয়ালীর নিকট সম্বন্ধ। ...বাউলের মধ্যে আছে বেহাগ, খাম্বাজ, ভৈরবী, বিলাবল প্রভৃতি রাগিণীর প্রভাব।"[৬৫]

এছাড়াও বিলাবল সুর সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন—

"গাম্ভীর্য ও শান্তরসের জন্য শুদ্ধ স্বরের বিলাবল সর্বপেক্ষা উপযোগী সুর। তবে বাউল গানে এই বিলাবল সুরের গাম্ভীর্য রক্ষা হয়নি। তার অন্যতম কারণ— বাউলের ছন্দোবাহুল্য। এর কারণ হল বাউল গান গাইবার সময় নৃত্য করে। বাউল গানে ছন্দায়িত প্রয়োজনে বিলাবলের গুরুগম্ভীর ভাবটি থাকে না।"[৬৬]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পাওয়া যায়—

১. বাউল গান দেশীয় সুরের গান।

২. এ গানের সুরের সঙ্গে রাগ-রাগিণীর মিলন ঘটেছে।

৩. গানের কলির শেষাংশ দ্রুত সুরে সমাপ্তি ঘটে।

৪. প্রেম-বিরহের সুরও লালনের গানে গীতিকবিতার মতই ধ্বনিত হয়।

---

৬১. শক্তিনাথ ঝা সম্পাদিত, বাউল-ফকির পদাবলি, ১ম খ¨, হাওড়া, ২০০৯, পৃ. ১৩.

৬২. মকছেদ আলী সাঁই, শাস্ত্রীয় সংগীত ও লালন গীতি, লালনসমগ্র, c~‡e©v³, পৃ. ৯৫৩.

৬৩. মৃদুলকান্ড়ি চক্রবর্তী, লোকসঙ্গীত, ঢাকা : প্যাপিরাস, ১৯৯৯, পৃ. ২৮.

৬৪. সুধাংশু শেখর শাসমল, রবীন্দ্রসঙ্গীতে বাউল ভাবনা : বাণী ও সুর, শ্রী সনৎকুমার সম্পাদিত বাউল-লালন- রবীন্দ্র, কলিকাতা : পুস্ড়ক বিপণী, ১৯৯৫, পৃ.২৬.

৬৫. লোকসঙ্গীত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

৬৬ . পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯.

৫. বাউল গানের সুর একঘেয়েমি সেখানে তত্ত্ব-কথা ছাড়া দর্শক-শ্রোতাকে আকর্ষণ করার আর কিছুই নেই।

৬. বাউল গানের সুনির্দিষ্ট সুর নেই।

৭. বাউল গানে প্রচলিত সাতটি সুরের সম্পর্ক রয়েছে।

৮. বাউল গানে বেহালা, খাম্বাজ, ভৈরবী, বিলাবিল রাগিণীর প্রভাব আছে।

৯. বাউল গানে নৃত্যের প্রচলন থাকায় বিলাবিল রাগিণীর গাম্ভীর্য কিছুটা ম্লান হয়।

১০. সারি ও ভাটিয়ালী সুরও এ গানে রয়েছে।

ড. আহমদ শরীফ বাউল গানের সুরের একঘেয়েমির কথা বলেছেন তা সর্বাংশে সঠিক নয়, এখানেও সুরের বৈচিত্র্য ও আকর্ষণ রয়েছে। মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী বাউল গানের সুনির্দিষ্ট সুর নেই বলেছেন, এমন মন্তব্যও কতটুকু সঠিক তাও বিবেচনার বিষয়। তবে বাউল গানের রাগ-রাগিণী কি রূপ তার প্রকৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য বেশ কয়েকজন সংগীতজ্ঞ ব্যক্তির মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। এঁদের মতামত এরূপ যে, বাউল গানে রাগরাগিণীর ব্যবহার নেই, কারণ এ গানগুলো সচেতনভাবে রাগ-রাগিণী প্রধান হিসেবে রচিত হয়নি। যেহেতু এগুলো গান সেহেতু সপ্তস্বর, ছয় রাগ এবং ছত্রিশ রাগিণীর কোনো না কোনো শাখায় গিয়ে পৌঁছে।[৬৭] লোকসংগীতের অন্যান্য ধারার চেয়ে বাউল গান একটু ভিন্ন এ জন্য যে, এগুলো একেবারে গুরুমুখী গান। অন্যদিকে রাগ-রাগিণীও গুরুমুখী সংগীতবিদ্যা। অনেক বাউল শিল্পীকে রাগ-রাগিণী নির্ভর করে গান গাইতে দেখা যায়। তাই সকালে ভৈরবী রাগে গোষ্ঠ গান এবং সন্ধ্যায় গৌরী রাগে গৌরগান গাওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। কাজেই বাউল তথা লালনের গান রাগ-রাগিণীর বাইরে নয়।[৬৮] বিশিষ্ট সুরকার ও সংগীতজ্ঞ সুধীন দাসের মতে বাউল গান সচেতন প্রয়াসে রাগ প্রধান গান হিসেবে গড়ে উঠেনি, তাই এখানে রাগরাগিণীর প্রসঙ্গ গৌণ। তবে বাউল গানের শরীরে এক বা একাধিক রাগরাগিণীর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। এরূপভাবে বিচার করলে জারি, সারি, ভাটিয়ালী গানেও রাগ-রাগিণী বিদ্যমান।[৬৯] প্রকৃতির ঝরণা ধারার মতই বাউল গান হৃদয়ক্ষেত্র থেকে প্রবাহিত হয়েছে এবং এর স্রোতধারায় রাগ-রাগিণী একেবারে ভেসে যায়নি। এ ব্যাপারে সুকুমার রায়ের উক্তিটি গ্রহণযোগ্য—

> “রাগসংগীতের মেলডির দেহে লোকসংগীতকে আকর্ষণ করে মিশিয়ে নেওয়া ভারতীয় সংগীতের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।”[৭০] বস্তুত লালনের গানেও একথা প্রযোজ্য।

---

৬৭. ড. দেবপ্রশাদ দাঁ, শিক্ষক, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সাক্ষাৎকার তারিখ : ১৫.১১.২০১৩, স্থান : জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৬৮. ড. সায়েম রানা, খণ্ডকালীন শিক্ষক, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, সাক্ষাতকার তারিখ : ১৬.১১.২০১৩, স্থান : সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৬৯. সুধীন দাশ, সুরকার ও সংগীতজ্ঞ, শিক্ষক সংগীত বিভাগ, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, সাক্ষাৎকার তারিখ : ১৭.১১.২০১৩, স্থান : নজরুল ইনস্টিটিউট, বাড়ি # ৩০৩/বি, রোড # ২৮, ধানমন্ডি, ঢাকা।

৭০. উদ্ধৃত, অমলেন্দু বিকাশ করচৌধুরী, রাগ প্রধান গানের উৎস সন্ধানে, কলিকাতা : ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৪, পৃ. ৭৯।

চতুর্থ অধ্যায়
লালন-গীতির শিল্পসৌন্দর্য

দীর্ঘ দুই শতাব্দী ধরে বাউলগান আমাদের নিজস্ব সংগীতের ধারাকে বাঁচিয়ে রেখেছে তেমনি মানুষের হৃদয়ে যোগ করছে নতুন সুর-ছন্দ আর ভাব-প্রেরণার সম্ভার।[১] বাউল জগতের আরাধ্য ব্যক্তিত্ব ফকির লালন শাহ জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে গভীর তত্ত্বকথাকে সাধকের প্রগাঢ় চিন্তা-চেতনার মধ্য দিয়ে পরম স্রষ্টার নৈকট্য লাভে আত্মসমর্পণ করেছেন গানের সুর ও বাণীতে। তিনি হয়ে উঠলেন উনিশ শতকের নবজাগ্রত বাঙালি হৃদয়ের ধর্ম-শাস্ত্র নিরপেক্ষ মৃত্তিকানির্ভর মানবসাধনার এক মহান পুরুষ। তাঁর অধ্যাত্ম-সাধনার গূঢ়-গুহ্য তত্ত্বকথা বাউল গানের মাধ্যমে শিষ্য-সম্প্রদায়ের কাছ থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে আমজনতার কাছে গিয়ে পৌঁছল। তাঁর গানগুলো সুরে-ছন্দে, তত্ত্ব-দর্শনে সৃষ্টি করল এক অভিনব শিল্প-চেতনা এবং হয়ে উঠল শিল্প-সংস্কৃতির এক অনন্য উপকরণ। হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় গানগুলোতে তত্ত্ব-কথা ছাড়াও জন্ম নিল নান্দনিক শিল্পের। চর্যাগীতিকা বা বৈষ্ণব পদাবলি সাধনসঙ্গীত হয়েও যেমন শিল্প-সাহিত্য-সৌন্দর্যের আকর ছিল, তেমন লালন-গীতিও এর ব্যতিক্রম নয়।

বাউলদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলতে তাঁদের রচিত গানগুলোকে বোঝায়; উল্লেখ্য যে ফকির লালন শাহ প্রায় ৭০/৮০ বছর ধরে গান রচনা করেছিলেন। নিত্য নতুন গান সৃষ্টি করাই ছিল তাঁর প্রবৃত্তি। তিনি স্বভাবকবির মতই মুখে মুখে গান রচনা করতেন। অধ্যাত্ম-সংগীত হয়েও ভাব ও সুরের মাধুর্যে অতুলনীয়; তত্ত্ব-দর্শন সমৃদ্ধ, সুর-ছন্দে বিকশিত এবং শিল্পবোধে অনন্য। আর এ গানগুলো হৃদয়ক্ষেত্র থেকে উৎসারিত, যার আবেদন আজ সর্বত্র। এ প্রসঙ্গে ড. মুহম্মদ এনামুল হক যথার্থই উল্লেখ করেছেন—"হাতে একটি একতারা কি দোতারা, গায়ে অসংখ্য তালি দেওয়া আলখেল্লা, কণ্ঠে স্ফটিক প্রবাল পদ্মবীজ ও রুদ্রাক্ষ প্রভৃতির একটি বিরাট মালা, কপালে তিলক, স্কন্ধে ঝুলি, হস্তে একটি বক্র যষ্টি ও দীর্ঘ কিস্তি প্রভৃতি লইয়া, বাউল যখন আপন মনে উদাস সঙ্গীত গাহিয়া পথ বাহিয়া চলে, তখন সত্যই সংসারী ব্যক্তির হৃদয়কেও একটি উন্মাদ ঔদাস্যের আবেশে মুগ্ধ করিয়ে দেয়।"[২] শব্দের সুষম ব্যবহার, অলংকার প্রয়োগ, উপমা-রূপক-চিত্রকল্প-উৎপ্রেক্ষা, প্রবাদ-প্রবচন-সুভাষণ প্রভৃতির শিল্পসম্মত পরিবেশন বাউল তথা লালনের গানের তত্ত্বকথার অন্তরালে সৃষ্টি হয়েছে এক কালোত্তীর্ণ শিল্পবোধ।

লালন-গীতির বৈভবে ভাব-ভাষা-ছন্দ-অলংকারেরও অনন্য মেলবন্ধন দৃষ্টিতে পড়ে। ভাবের বিস্তারের বাহন হিসেবে ভাষা প্রসঙ্গ আসে; ভাবের গভীর দ্যোতনায় সাধারণ ভাষারও দ্যুতি একাকার হয়েছে। নিম্নোক্ত গানে এ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী
কেম্‌নে আসে যায়
ধ'রতে পারলে মন-বেড়ী
দিতাম পাখীর পায় ॥

আট কুঠরী নয় দরজা আঁটা
মধ্যে মধ্যে ঝর্‌কা কাটা
তার উপরে সদর কোঠা
আয়না মহল তায় ॥

---

১. ডক্টর মযহারুল ইসলাম, বাউল, রেডিও পাকিস্তান কর্তৃক প্রকাশিত পূর্বপাকিস্তানের লোক-কৃষ্টি, জুন ১৯৬৮, পৃ. ১১.

২. মুহম্মদ এনামুল হক, বঙ্গে সূফী প্রভাব, ঢাকা : র‍্যামন পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬, পৃ. ১২৬-১২৭.

মন তুই রইলি খাঁচার আশে
খাঁচা যে তোর তৈরী কাঁচা বাঁশে
কোন্ দিন খাঁচা পড়বে খ'সে
লালন ফকীর কয় ॥[৩]

আবার, সহজ-সরল গ্রাম্যভাষার মধ্য দিয়ে অতি সহজেই ভাবের প্রকাশ ঘটেছে এভাবে—

মাখাল ফলটি রাঙা চোঙা
তা দেখে মন হোল ঘোঙা
লালন কয় তানুয়া ডোঙা
কোন ঘড়ি ডুবায় তুফানে।

লালনের গানের ভাবে যেমন সংহতি, সংযম ও কাঠিন্য রয়েছে তেমনি ভাষার ক্ষেত্রে ঋজুতা, ব্যঞ্জনাবহ অর্থঘনত্ব ও ধ্বনিঝংকার সৃষ্টি করেছে। এরূপ দৃষ্টান্ত তাঁর গানে পাওয়া যায়— 'মণিপুরে হাট মনোহারী কল/তেহাটা ত্রিবিণী তাহে বাঁকা নল।' এবং 'খেলকা তাজা ডোর কোপীনী'।[৪] এরূপ বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

বিচিত্র শব্দের সুষম বিন্যাসে লালনগীতিতে অপূর্ব চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হয়েছে। স্বভাব কবি লালনের প্রয়োগ নৈপুণ্যে আটপৌরে শব্দগুলো প্রাণ পেয়ে স্পন্দিত হয়েছে নতুন এক অর্থব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে। 'বাড়ির কাছে আরশিনগর সেথা এক পড়শী বসত করে' এ গানটির মধ্য দিয়ে পরম আকাঙ্খিত অচিন এক পড়শীর সঙ্গে মিলনের ব্যাকুলতা প্রকাশিত হয়েছে। আর এ পরম অচিন পড়শীর স্পর্শেই তাঁর ভবযন্ত্রণা যেন ঘুচে যেত। কিন্তু 'সে আর লালন একখানে রয়/তবু লক্ষ যোজন ফাঁকরে'। লক্ষণীয় যে 'যোজন' শব্দটির প্রয়োগ দূরত্ব-জ্ঞাপক, যোজনের পরিবর্তে অন্যকোন শব্দ এখানে ব্যবহৃত হলে তা শিল্পমণ্ডিত হওয়ার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াত। এমনকি গানটির শিল্প-বন্ধন শিথিল হয়ে যেত।[৫]

সময়-কাল-স্থান নিরপেক্ষভাবে লালন ফকিরের মননে এরূপ শব্দ যোজনা পরিশীলিত শিল্পের জন্ম দিয়েছে। 'কে কথা কয় রে দেখা দেয় না' এ গানে দর্শনাতীত অথচ অনুভবের সত্তাময় রূপ পাবার ব্যাকুলতা ব্যক্ত হয়েছে। এরূপ এ গানেই অন্য একটি পঙ্‌ক্তিতে রয়েছে 'ক্ষিতি জল কি বায় হুতাসন' এর বিকল্প বিন্যাস কিংবা বিকল্প শব্দ চয়ন আদৌও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।[৬]

এছাড়াও লালনের গানে অনেক লৌকিক ও দেশী শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। শব্দের কিছু বিকৃতি ঘটিয়ে এরূপ গ্রাম্য বা লৌকিক শব্দগুলো প্রয়োগে ভাষার মাধুর্য বর্ধিত হয়েছে। যেমন—'গেরাম বেড়ে অগাধ পানি' এখানে গ্রাম শব্দটির গ্রাম্যরূপ গেরাম; 'কোনা-কানছি, তোড়ানি, ঘাট-অঘাট, পিরীত, কপনিধ্বজা, আগম-নিগম, মাকাল, জান্তে-মরা ইত্যাদি।[৭]

তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার লালনের গানকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে তেমনি বিস্ময়ও জাগে নিরক্ষর সাধক এ কবি কিভাবে এগুলো আয়ত্ত করেছেন। এরূপ শব্দসমূহ যেমন—চন্দ্র, জল, বায়ু, অগ্নি, নিরঞ্জন, স্কন্ধ, লক্ষ্য, অর্মত্য, নিষ্ঠা, ভুজঙ্গনা, মীন, দর্পণ, কিঞ্চিৎ, দিবা, নপুংসক,নির্বিকার, অন্বেষণ, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, শমন ইত্যাদি। যেমন—'আমি বলব কি পড়শীর কথা,/হস্ত পদ স্কন্ধ মাথা/নাইরে'/ লালন তাঁর গানে একাধিক সমার্থক শব্দ (আরশি, আয়না, দর্পণ) ব্যবহার করেছেন যা ভিন্নতর

---

৩. এস.এম. লুৎফর রহমান, লালন শাহ : জীবন ও গান, ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৬, পৃ. ১৩৫
৪. শক্তিনাথ ঝা, ফকির লালন সাঁই : দেশ কাল এবং শিল্প, কলিকাতা : ১৯৯৫, পৃ. ৩০৩
৫. আনোয়ারুল করিম, বাউল কবি লালন শাহ, কুষ্টিয়া : ১৩৭৩, পৃ. ৭২
৬. আবুল আহসান চৌধুরী, লালন সাঁইয়ের সন্ধানে, ঢাকা : পলল প্রকাশনী, ২০০৭, পৃ. ৫০
৭. আনোয়ার‍ুল করিম, বাউল সাহিত্য ও বাউল গান, কুষ্টিয়া : ১৯৭১, পৃ. ২১৪

ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে। যেমন—'বাড়ির কাছে আরশিনগর'; 'আয়নামহল তায়'; 'জানো না মন পারাহীন দর্পণ'।[৮] বস্তুত লালনের 'মনের মানুষ'কে তিনি 'আরশিনগরের পড়শি' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আবার মানব দেহকে বাড়ি বা গৃহের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যে বাড়ির দেয়ালে আয়না লাগনো আছে তাকে আয়নামহল বলে। সাধরণত লালন দিব্যদৃষ্টিতে দেহের মাঝেও এরকম এক বাড়ির সন্ধান পেয়েছেন। কোনো কিছুকে দেখতে হলে আয়নাতে পারা লাগানো হয়। কিন্তু যথার্থ সাধক লালন তিনি তাঁর মন-দর্পণে পারা লাগানো ছাড়াই সবকিছুকে দেখতে পেরেছিলেন।

অর্ধতত্ভব শব্দও বহুক্ষেত্রে লালনের গানকে সমৃদ্ধ করেছে। যেমন—হাত, পা, ইসারা, সাধ, ছার ইত্যাদি।[৯] যেমন—

হাতের কাছে হয় না খবর,
কি দেখতে যাও দিল্লি লাহোর,
সিরাজ সাঁই কয়, লালন রে তোর
সদায় মনের ভ্রম গেল না।

শব্দের দ্বিত্ব-ব্যঞ্জনের মধ্য দিয়ে লালনের গানগুলো ভিন্নতায় নবোৎকর্ষে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন—

আবার ভাদ্র মাসে লাঙ্গল চষে
হাপুর-হুপুর বীজ বুনিলে
জোয়ার এসে নেয় ভাসাইয়া,
কিসে রে তোর ফলবে ধান।[১০]

এরূপ 'ফণিমণি' 'বেদবেদান্তে', 'দিনে দিনে', 'ধরফর', 'আড়ি-ওড়ি', 'বুড়ো হুড়ো' ইত্যাদি।

লালন হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্যের সমন্বয় সাধনে যেমন সিদ্ধহস্ত ছিলেন তেমনি সংস্কৃত-সাধিত শব্দের পাশাপাশি আরবি, ফারসি শব্দেরও যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামের গান ও কবিতায় এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আরবি, ফারসি শব্দের এরূপ ব্যবহার প্রসঙ্গে সঙ্গীত-সমালোচক আবু জাফরের বক্তব্যটি প্রাণিধানযোগ্য :

> ...আরবি-ফারসি শব্দ ও বাক্যবন্ধের সফল প্রয়োগের যে কৃতিত্ব আমরা নজরুল ইসলামের আরোপ করে থাকি সেই কৃতিত্ব আরো আগে আরো অনিবার্যভাবে লালনের প্রাপ্য।"[১১]

এখন আরবি, ফারসি শব্দ ব্যবহারের কিছু দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হল :

বারামখানা (আরবি-ফারসি শব্দ)- আপন ঘরের খবর লে না।
অনায়াসে দেখতে পাই
কোনখানে কার বারামখানা।[১২]

মোকাম (আরবি শব্দ)- আঠার মোকামের মাঝে
জ্বলছে একটি রূপের বাতি।[১৩]

পাঞ্জাতন (ফারসি শব্দ)- ঘরে আছে পাঁচ পাঞ্জাতন
ওরে আত্মা পাঞ্চ জন
আত্মা দিয়ে আত্মার করে রে ভজন ॥[১৪]

---

৮. লালন সাঁইয়ের সন্ধানে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১
৯.আনোয়ারুল করিম, বাউল সাহিত্য ও বাউল গান, ঢাকা : প্রথম পারিজাত প্রকাশন, ২০০৮, পৃ. ২২৫
১০. ওয়াকিল আহমদ, লালন গীতি সমগ্র, ঢাকা : বইপত্র, ২০০৫, পৃ. ৯০
১১. উদ্ধৃত, লালন সাঁইয়ের সন্ধানে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২
১২. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫

মুরশিদ (আরবি শব্দ) :	মুরশিদ বিনে কি ধন আর আছে রে মন এ জগতে ॥
ফকির (আরবি শব্দ) :	মনসুর হাল্লাজ ফকির সে তো বলেছিল আমি সত্য...[১৫]
জমি (ফারসি শব্দ) :	কত কত লক্ষ জমি ভ্রমণ করেছ তুমি;[১৬]
গোর (ফারসি শব্দ) :	গোরের কিনারা যখন লয়ে যায় কাঁদিয়ে সবাই জীবন ছাড়তে হয়...[১৭]
খোদা (ফারসি শব্দ) :	খোদার তত্ত্ব বান্দার দেল যথা বলেছে কোরানে খোদে খোদ কর্তা... [১৮]
বেহেশ্‌ত (ফারসি শব্দ) :	ম'লে পাব বেহেশ্‌ত খানা তা শুনে আর মন মানে না... [১৯]
আরজি (আরবি-ফারসি শব্দ) :	আরজি করি বারে বারে লালন বলে, আমার পরে একবার ফিরে চাইলে না ॥[২০]

এরূপ অসংখ্য আরবি, ফারসি শব্দ ছাড়াও ইংরেজি শব্দেরও ব্যবহারে লালন দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। যেমন—গড, কোট, জুরি, বেরাদর (ব্রাদার), ম্যাজিস্টারি (ম্যাসিস্ট্রেট), পক্লো (পক্স) ইত্যাদি।[২১] এরূপ দৃষ্টান্ত যেমন—

১. আরবী ভাষায় বলে আল্লা
ফারসীতে হয় খোদাতালা
গড বলিছে যীশুর চেলা
ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভাবে।[২২]

ভাষার ভিন্নতা থাকতে পারে কিন্তু পরম স্রষ্টাকে সকলেই আপন আপন ভাষায় স্মরণ-ভজন-পূজন করে।

২. আপনি করে ম্যাজিস্টারি
আপনি হাতে বেড়ি পরে॥[২৩]

ইংরেজ-প্রবর্তিত বিচার ব্যবস্থায় মেজিস্ট্রেট বেড়ি পরিয়ে কয়েদির বিচার করত। গণবিদ্রোহ ঠেকিয়ে রাখার জন্য এরূপ বিচারে জেল বা ফাঁসিও হতো। সেই আলোকে লালন তাঁর গানে এরূপ উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ সাধন জগতের যথার্থ কর্মের ভুলে নিজেই নিজের বিবেকের কাঠগড়ায় বন্দি হয়ে যায়।

---

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩-৯৪.
১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬.
১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬.
১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৭.
১৯. এস.এম. লুৎফর রহমান, লালন-গীতি চয়ন, ঢাকা : ১৯৮৫, পৃ. ৫০
২০. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬.
২১. লালন সাঁইয়ের সন্ধানে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২.
২২. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৩
২৩. খোন্দকার রিয়াজুল হক, মরমী কবি লালন শাহ : জীবন ও সংগীত, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯, পৃ, ১৪৬

এছাড়াও বৈষ্ণব পারিভাষিক বহু শব্দ যেমন—বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, নরোত্তম, মুকুন্দ-রচিত কড়চার শব্দ, ভাষা, বাক্য লালনের গানে আছে।[২৪] লালন-গীতির এরূপ বিচিত্র শব্দভাণ্ডারের প্রতি লক্ষ্য করে ড. আশরাফ সিদ্দিকী উল্লেখ করেছেন—

"লালন-গীতিতে অসংখ্য শব্দের এই বিচিত্র ব্যবহার লক্ষণীয়। বিভিন্ন শব্দের মৌলিক এবং সঠিক অর্থযুক্ত ব্যবহার রীতিমত বিস্ময়কর।"[২৫]

লালন-গীতিতে এরূপ শব্দ-মটিফিম বা প্রতীকধর্মিতার মধ্য থেকে লালনের মানস গঠন, ব্যক্তিত্ব, কবিত্ব, সমাজচিত্র, সাধনপন্থা সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যায়। লালন গবেষক শক্তিনাথ ঝা এসম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন—

"আধুনিক যুগের সূচনায় ফ্রান্সের চিত্রশিল্পে প্রতীক আন্দোলন সূচিত হয়। কিন্তু প্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষে প্রতীককল্পনা ও সৃষ্টি গণমানসে অতি পরিচিত বিষয়। এই প্রতীক ঈষৎ স্বতন্ত্র স্বাদে। দুটি বস্তুর নানাবিধ সম্পর্ক প্রতীকে রূপলাভ করে। এই প্রতীকের নানা ধরণের ব্যাখ্যার ঐতিহ্য আধুনিক যুগে গড়ে উঠেছে।... এগুলি লালনের কাব্যভাষায়ও আবিষ্কার করা যায়।"[২৬]

তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, লালনের প্রতীক ব্যবহারে কাঠামোগতভাবে দুটি বিষয় পাওয়া যায়—১. বস্তুর পরিচয়, ২. বস্তুটি দ্বারা বাধিত প্রতীক অর্থ। এছাড়াও তিনি প্রতীকগুলিকে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করেছেন যেমন—(ক) নিসর্গ কেন্দ্রিক- ফুল, বৃক্ষ, বীজ, চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, মেঘ, বটবৃক্ষ ইত্যাদি। (খ) প্রাণীবাচক- কুমীর, সাপ, ব্যাঙ, চাতক, ময়ূর, মাছ, কুমরী পোকা। (গ) ধাতুবিষয়ক- সোনা, পিতল, লোহা। (ঘ) অন্যান্য বস্তুকেন্দ্রিক- পরশমণি, রং, আলো, অক্ষর, ঘর, ফাঁদ, দ্বার, ঋণ ইত্যাদি। (ঙ) মানবিক- চোর, সেপাই, পিতৃধন, মা, পুত্র প্রভৃতি।[২৭]

বস্তুত লালন অতিপরিচিত দৃশ্যমান জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতীকসমূহের উপাদান ব্যবহার করে বক্রতায়, তির্যক ভাষণে এবং ক্রম-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে অতিপরিচিত এখানে অপরিচিত করে তুলেছেন।[২৮] এ বিষয়ে উদাহরণ দিলেই আরও পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। যেমন, প্রথম পর্বের একটি প্রতীক ফুল। লালনের গান এরূপ—

নিরাকারে ভাসছে রে এক ফুল।
বিধি বিষ্ণু হর
আদি পুরন্দর
তাদের সে ফুল হয় মাতৃফল ॥
বলবো কি সে ফুলের গুণ বিচার
পঞ্চমুখে সীমা দিতে নারে হর।
যারে বলি মূলাধার
সেও তো অধর।
ফুলে আছে ধরা চোর সমুতুল ॥
লীলা নিত্য পাত্রস্থিত সে ফুলে
সাধকের মূল বস্তু এ ভূ-মণ্ডলে।
সে যে বেদের অগোচর
সে ফুলের নাগর

২৪. ফকির লালন সাঁই : দেশ কাল এবং শিল্প, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৫.
২৫. ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, লালন গীতিতে শব্দ-মটিফিম, দৈনিক সংবাদ, ২৫ পৌষ, ১৩৮৩.
২৬. ফকির লালন সাঁই : দেশ কাল এবং শিল্প, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯১.
২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯২.
২৮. ফকির লালন সাঁই : দেশ কাল এবং শিল্প, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৩

সাধুজনা ভেবে করছে উল ॥
কোথায় বৃক্ষ হারে কোথায় রে তার ডাল
তরঙ্গে পড়ে ফুল ভাসছে চিরকাল
সে যে কখন এসে অলি
মধু খায় ফুলি
লালন বলে, চাইতে গেলে দেয় ভুল ॥[২৯]

দেহকে বৃক্ষের সাথে উপমা চর্যাকারেরাও দিয়েছেন। লালনের গানে উপমেয় নারীদেহ মিশে যায় বৃক্ষ ও ফুলে। ফলে দেহে পুষ্প বিকশিত হয় এবং বৃক্ষ হয় রজঃস্বলা। আর এগুলো প্রকাশের মাধ্যম হলো এরূপ প্রতিকী ভাষা। কেননা এ ফুল বেদের অগোচর (বেদ রজঃ সাধনার বিরোধী); ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর, পুরন্দরের মাতৃফুল। এ ফুল সাধনার মূল বস্তু (রজঃসাধনা) এবং এ সাধনায় ভবদুর্গতি দূর হয়। এ ফুলে মধু থাকে, ফলে (স্তনে) থাকে অমৃতসুধা। নারীদেহেই এ ফুল ফোটে। কারণবারির মধ্যে (সৃষ্টির কারণে রজঃ) ভেসে বেড়ায় আর প্রতিমাসে প্রেমের ঘাটে আসে। এ ফুলের গানে প্রতীকী ভাষায় রজঃ সাধনার সংকেত পাওয়া যায় এবং সাধনাটি অধিক শাস্ত্রনিন্দিত বলে অধিকতর আবৃত থাকে।[৩০]

চাতক

মেঘে কত করে ফাঁকি
তবুও চাতক মেঘের ভুখি
তেমনি নিরিখ রাখলে আঁখি
সাধক বলে।[৩১]

সাধনার পথ যে কুসুমাস্তীর্ণ নয় বরং কন্টকাকীর্ণ, এর পদে পদে রয়েছে নানা রূপ প্রলোভন, আছে নিজের মধ্যে কুপ্রবৃত্তি কিংবা রিপুর আনাগোনা; এগুলো অতিক্রম করতে হবে আত্মশুদ্ধি, ইন্দ্রিয় দমন, প্রবৃত্তির ধ্বংস আর চিত্তশুদ্ধির মধ্য দিয়ে নিরিখ ঠিক রেখে, অর্থাৎ প্রকৃত ফল লাভের জন্য সাধককে এ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

চাতক পাখি যেমন মেঘের জল ছাড়া অন্য পানি গ্রহণ করে না, তেমনি সাধনজগতে শত বাধা সত্ত্বেও সাধককে অনঢ় থাকতে হবে।

সোনা

জেনে শুনে সোনা ফেলে
মন মজালাম রাঙ পিতলে,
এ লাজের কথা
বলিব কোথা
আর এখনি॥[৩২]

সঠিক সময় সঠিক বিষয়কে প্রাধান্য না দিয়ে মেকী আড়ম্বরপূর্ণ ঠাঁট বজায় রাখার হাস্যকর প্রয়াসে সদাব্যস্ত সবাই। তাই সোনা পড়ে রইল মূল্যহীন আর জহুরীর কদরও হ্রাস পেতে থাকে। ফলে সোনার স্থলে পিতলের মজদুরীতে ব্যস্ত গণমন। অর্থাৎ প্রকৃত সাধনার জগত থেকে নকলের সমাদর বেশি।

---

২৯. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩-১৭৪.
৩০. ফকির লালন সাঁই : দেশ কাল এবং শিল্প, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৩-৩৯৪.
৩১. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৪.
৩২. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯.

ঘর

আপন ঘরের খবর লে না।
অনায়াসে দেখতে পাবি
কোনখানে কার বারামখানা ॥[৩৩]

নিজের দেহঘরে অজস্র সম্পদ রয়েছে। আর এ ঘরে 'অধর মানুষ' হাওয়ারূপে প্রতিনিয়ত যাতায়াত করে। আর তাই সাধকের উচিত এ ঘরের খবর নেওয়া, এ ঘরে হাওয়ার গতি, স্থিতি আর উৎপত্তি সম্বন্ধে সমক্য জ্ঞান লাভ করলেই সাধনায় সিদ্ধ হওয়া সম্ভব। তাই লালনের গানে 'ঘর' প্রতীক সাধনার বিরাট কারখানা বলে আভাসিত।

চোর

গিয়েছিলাম ভবের বাজারে
ছয় চোরা চুরি করে
গুরু বাঁধে আমারে।
তাই সিরাজ সাঁই খালাস পাইল
লালনেরে দিল জেলখানা।[৩৪]

লালনের ভবের হাট-বাজার চতুর চোরের এ বড় রাজত্ব। এ চোর দশ ইন্দ্রিয় আর ষড়রিপুর সহায়তায় আপন ঘরে সিঁধকাটে যার অপর নাম নারীসত্তা। এ নারীসত্তা পুরুষের পিতৃধন চুরি করে নেয়, যার ফলে সন্তান জন্মদানসহ অন্যান্য সাধন বহির্ভূত কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য করে। অথচ গুরু নির্দেশ উপেক্ষা করে এগুলো সম্পন্ন হয় ফলে গুরু-দণ্ড গ্রহণ করতে হবে। তাই ষড়রিপুকে এ প্রতীকে আভাসিত করা হয়েছে।

এরূপ অসংখ্য শব্দ-মটিফিম বা প্রতীকের অজস্র ব্যবহার লালনগীতির শিল্প-বৈভবের ক্ষেত্রে ভিন্নমাত্রা যোগ করেছে।

শব্দের ব্যবহারে যে নৈপুণ্যের সৃষ্টি হয়েছে তা সংগীত বিশারদদের ভাবনায় নতুন সম্ভাবনার বাতিঘর হিসেবে প্রতীত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সংগীত সমালোচক আবু জাফর যথার্থ মন্তব্য করেছেন :

"আরবি-ফারসি নয়, প্রচলিত-অপ্রচলিত তৎসম কি দেশজ সবকিছুই এক অখণ্ড অবিভাজ্য সুরের দ্রবণে নিঃশেষে দ্রবীভূত হয়ে গেছে লালন গীতির মধ্যে। এবং সব মিলিয়ে লালন এমন এক ঐশ্বর্যশালী সাঙ্গীতিক আবহ লালন করেছে যা থেকে এমন সিদ্ধান্ত অবশ্যই পরিগ্রহ করতে হয় যে, তিনি বাংলা গানকে শুধু সমৃদ্ধ করেননি, অনেক সম্ভাবনার দ্বারও উন্মোচন করে দিয়েছেন।'[৩৫]

বাউল কবিরা শুধু দীপ্তিময় রচনায় সব কিছুর নিছক বিবরণ দেননি এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন অলংকারের আভরণ।[৩৬] বাউল শিরোমণি লালনের গানেও বিচিত্র অলংকারের পরিচয় পাওয়া যায়।

অলংকার

অলংকার দুই প্রকার—শব্দালংকার ও অর্থালংকার। লালনের গানে উভয় প্রকার অলংকারের প্রাচুর্য রয়েছে।

---

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬
৩৪. পূর্বোক্ত, ১৮৭-১৮৮
৩৫. আবুল আহসান চৌধুরী, লালনসমগ্র, ঢাকা : পাঠক সমাবেশ, ২০০৯ (পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ৯৬৪
৩৬. ডক্টর এস.এম লুৎফর রহমান, বাউল তত্ত্ব ও বাউল গান, ঢাকা : ধারণী সাহিত্য সংসদ, কার্ত্তিক, ১৩৯৭, পৃ. ১৩৯

শব্দালংকার

শব্দের উচ্চারণের জন্য ধ্বনির প্রয়োজন হয়। আর সেই ধ্বনিকে কেন্দ্র করে যে অলংকার হয় তাকে শব্দালংকার বলে।[৩৭] নিম্নে শব্দালংকারের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হলো :

অনুপ্রাস

একই ধ্বনি বারবার উচ্চারিত হলে অনুপ্রাস অলংকার হয়।

১. ধর রে অধর চাঁদেরে অধরে অধর দিয়ে।[৩৮]

২. কারুণ্য তারুণ্য এসে লাবণ্যে যখন মিশে।[৩৯]

৩. নূরে নরে দুটি নেহার কেমনে ঠিক রাখা যায়।[৪০]

উদ্ধৃতিতে প্রথম 'র' ধ্বনি, দ্বিতীয়টিতে 'ণ' ধ্বনি এবং তৃতীয়টিতে 'ন' ধ্বনি বারবার উচ্চারিত হয়ে অনুপ্রাস অলংকারের সৃষ্টি করেছে।

যমক

একই শব্দ একই স্বরধ্বনি সমেত একই ক্রমানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে একাধিকবার ব্যবহৃত হলে তাকে যমক অলংকার বলে।

১. আমার আপন খবর আপনার হয় না
সে যে আপনারে চিনলে পরে, যায় অচেনার চেনা।[৪১]

২. যাদের সঙ্গে রলি চিরকাল
কালা কালে তারাই হবে কাল।[৪২]

৩. যে পরশে পরশ হবি
সে করণ আর কবে করবি
সিরাজ সাঁই কয়, রলি
ফাঁকে বসে।[৪৩]

এখানে প্রথম চরণে 'আপন' নিজ এবং দ্বিতীয় চরণে 'আপনারে' অর্থাৎ পরম পুরুষকে বুঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবে প্রথম 'কাল' সময় দ্বিতীয় 'কাল' জম বা শত্রু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার 'পরশ' শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, প্রথমে 'পরশ' বলতে স্পর্শ এবং দ্বিতীয়টি মহিমান্বিত। অতএব এগুলো যমক অলংকারের দৃষ্টান্ত।

শ্লেষ

শব্দ একবার মাত্র ব্যবহার হয়ে বিভিন্ন অর্থ বুঝালে তাকে শ্লেষ অলংকার বলে।

---

৩৭. শুদ্ধসত্ত্ব বসু, অলংকার-জিজ্ঞাসা, কলিকাতা : সুপ্রকাশ লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ১৯৬২, পৃ. ৫ (পরিবর্ধিত ২য় সং)
৩৮. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৪
৩৯. আবুল আহসান চৌধুরী, লালন সাঁই, ঢাকা : সূচিপত্র, ২০০৯, পৃ. ৪৭ (২য় সংস্করণ)
৪০. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ, ২৯৬
৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭.
৪২. পূর্বোক্ত,পৃ. ১০৭.
৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪.

১. কেন মলি রে মন ঝাপ দিয়ে তোর
বাবার পুকুরে।[৪৪]

২. ছা'র জন্য আনিলাম আদার
আদারে ছা খেল এবার
লালন বলে এবার আমার
ভগ্নদশা ভারি।[৪৫]

৩. শহরে ষোল জনা বোম্বেটে
করিয়ে পাগলপারা নিলো তারা সব লুটে।[৪৬]

লালনের গানে 'পুকুর' শব্দের দু'টি অর্থ পাওয়া যায়—এক. বাহ্যার্থে দিঘি বা ক্ষুদ্র জলাশয় এবং দুই. তাত্ত্বিকার্থে স্ত্রী লোকের যৌনাঙ্গ। লৌকিক চেতনায় পুকুর, নৌকা, কড়ি প্রভৃতি নারীর যৌনাঙ্গের প্রতীকরূপে গণ্য হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে গানের এ অংশে 'আদার' শব্দটির দু'টি অর্থ রয়েছে। যেমন—এক. খাদ্য এবং দুই. খাদক। 'বোম্বেটে' শব্দটির দু'টি অর্থ রয়েছে। যেমন—এক. জলদস্যু এবং দুই. মানবদেহের দুশমন বা শত্রু। ষড়রিপু আর দশ ইন্দ্রিয়ের দুষ্টচক্রের নামই হচ্ছে ষোলজনা 'বোম্বেটে'। এরূপ একই শব্দ একাধিকার্থে ব্যবহৃত হয়ে শ্লেষ অলংকারের সৃষ্টি করেছে।

লালনে গানে অর্থালংকারের নানাবিধ দৃষ্টান্ত রয়েছে।

অর্থালংকার

যে অলংকার অর্থের আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তাকে অর্থালংকার বলে।[৪৭] নিম্নে অর্থালংকারের উদাহরণ দেওয়া হলো :

রূপক

উপমান ও উপমেয়-এর মধ্যে ভেদ তিরোহিত হলেই সেই উপমাই রূপক বলে অভিহিত হয়। রূপক অলংকার উপমানই বেশি প্রাধান্য পায় :

১. এই মানুষে আছে রে মন
যারে বলে মানুষ-রতন
লালন বলে, পেয়ে সে ধন
পারলাম না চিনতে।[৪৮]

২. প্রেম-রত্ন ধন পাবার আশে
ত্রিপীনের ঘাট বাঁধলাম কষে।[৪৯]

উপর্যুক্ত প্রথম উদ্ধৃতিতে মানুষের মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। পরেরটিতে 'প্রেমরত্ন ধন' পাবার জন্য শুদ্ধ প্রেমের কথা বলা হয়েছে। এখানে 'মানুষ' উপমেয় যাকে 'রতন' উপমানের সঙ্গে অভেদ কল্পনা

৪৪. পূর্বোক্ত,পৃ. ১১০
৪৫. পূর্বোক্ত,পৃ. ১৪১
৪৬. পূর্বোক্ত,পৃ. ১৮০
৪৭. অলংকার-জিজ্ঞাসা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫
৪৮. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮
৪৯. পূর্বোক্ত,পৃ. ২২৬

করা হয়েছে। এবং দ্বিতীয়টিতে 'প্রেম' উপমেয় 'রত্ন-ধন' উপমান হিসেবে এসেছে এবং উপমানই আধিক্য বজায় রেখেছে। তাই রূপক অলংকারের সৃষ্টি হয়েছে।

উপমা

উপমা অর্থ তুলনা। অর্থাৎ সাদৃশ্য কথন। সাদৃশ্য হচ্ছে দু'টি ভিন্ন জাতীয় বস্তু, যাদের পারস্পরিক বৈধর্ম থাকে অনুল্লেখিত এবং প্রসঙ্গোচিত সাধর্ম হয় উল্লেখিত :

১. মণিহারা ফণির মতোন
প্রেম-রসিকের দুটি নয়ন
কি দেখে কি করে সে জন
কে কাহার অন্ত পায় ॥[৫০]

২. শোণিত শুক্র চম্পকলি
কোন স্বরূপ কাহারে বলি-[৫১]

৩. গুরু, তুমি তন্ত্রের তন্ত্রী
গুরু, তুমি মন্ত্রের মন্ত্রী
গুরু, তুমি যন্ত্রের যন্ত্রী
না বাজাও বাজবে কেনো॥[৫২]

উপরের চরণগুলিতে প্রথমে শুদ্ধ প্রেমিকের প্রেম কাতরতার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে রজঃ ও বীর্যের স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। এবং তৃতীয়টিতে গুরু মহিমার কথা বলা হয়েছে। এখানে 'ফণির' সঙ্গে 'নয়ন' কে তুলনা করে সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। উপমার চারটি অংশ যথা—উপমেয় 'নয়ন', উপমান 'ফণি' সাধারণ ধর্ম–দেখার সাদৃশ্য অর্থে এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ 'মতোন', এটি পূর্ণোপমার দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয়টি স্পষ্টত সাদৃশ্যবাচক শব্দের উল্লেখ নাই তাই এটি লুপ্তোপমা এবং তৃতীয়টিতে উপমেয়ের একাধিক উপমান থাকায় এটি মালোপমা অলংকারের দৃষ্টান্ত।

উৎপ্রেক্ষা

নিকট সাদৃশ্যের জন্য উপমেয় উপমান বলে সংশয় হলে তা উৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়।

১. লাল জরদ সিয়া মণি
বেওরে সেই রূপের খনি
দেখতে শোভা যেন অমনি
তারার মালা চাঁদের গলে ॥[৫৩]

২. ব'লব কি সেই ফাঁদের কথা
কাক মারিতে কামান পাতা।[৫৪]

উপর্যুক্ত 'লাল', 'জরদ', 'সিয়া', 'মণি' দেহস্থিত বিভিন্ন মোকামের রঙের প্রতীক হিসেবে দেহ সাধনায় ব্যক্ত হয়। এখানে উপমেয়-'লাল জরদ সিয়া মণি' আর উপমান-'তারার মালা' এবং যেন শব্দটি দ্বারা সংশয়ের ভাবটি ফুটে উঠেছে। অতএব, এটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকারের উদাহরণ। তেমনিভাবে

৫০. পূর্বোক্ত,পৃ. ২৫০।
৫১. পূর্বোক্ত,পৃ. ২৩৫।
৫২. পূর্বোক্ত,পৃ. ২০০।
৫৩. বাউল তত্ত্ব ও বাউল গান, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯।
৫৪. এস.এম. লুৎফর রহমান, লালন-জিজ্ঞাসা, ঢাকা : ধারণী সাহিত্য-সংসদ, জানুয়ারি, ২০০৫, পৃ. ৭৭ (২য় সং)।

'ফাঁদ' উপমেয় আর উপমান-'কামান'। কিন্তু সংশয়ের 'যেন' শব্দটি অনুক্ত রয়েছে। 'কামান' শব্দটির আগে 'যেন' শব্দটি বসালে বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া যায়। অতএব, এটি প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা অলংকারের দৃষ্টান্ত।

অতিশয়োক্তি

উপমেয় ও উপমানের অভেদত্বের জন্য উপমান উপমেয়কে একেবারে গ্রাস করে ফেললে অতিশয়োক্তি অলংকার হয়।[৫৫]

১. এই দেশেতে এই সুখ হল
আবার কোথা যায় না জানি।
পেয়েছি এক ভাঙ্গা নৌকা
জনম গেল ছেঁচতে পানি॥[৫৬]

২. ফকীর লালন ম'ল জল পিপাসায় রে
কাছে থাকতে নদী মেঘনা।[৫৭]

উপমান-ভাঙ্গা নৌকা আর উপমেয়-লালনের জীবন (অনুক্ত)। কাজেই এটি অতিশোয়ক্তি অলংকার। এইরূপভাবে উপমান-মেঘনা নদী উপমেয় লালনের জ্ঞান-পিপাসা (অনুক্ত)। অতএব, এটিও একটি অতিশয়োক্তি অলংকার।

ব্যতিরেক

ব্যতিরেক শব্দের অর্থ পৃথকীকরণ বা ভেদ। উপমানের চেয়ে উপমেয়কে উৎকৃষ্ট কিংবা নিকৃষ্ট করে দেখানোর মধ্য দিয়ে যে চমৎকারিত্ব প্রকাশ পায়, তাই সহজ কথায় ব্যতিরেক।

গুরু শিষ্য এমনি ধারা
চাঁদের কোলে থাকে তারা
কাঁচা বাশে ঘুণে জ্বরা
গুরু না চিনলে ঘটে তাই ॥[৫৮]

এখানে উপমান হচ্ছে 'চাঁদের কোলে তারা'। আর উপমেয় 'গুরু-শিষ্য'। এবং গুরু না চিনলে শেষ পর্যন্ত 'কাঁচা বাঁশে ঘুণে ধরা' অবস্থা ঘটে, অর্থাৎ প্রকারান্তে উপমেয়কে নিচু করে দেখানো হয়েছে। প্রথমটি উপমা এবং দ্বিতীয়টি ব্যতিরেক অলংকারের দৃষ্টান্ত।

বিরোধ

আপাত দৃষ্টিতে দু'টি বস্তুর মধ্যে বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান হলে যখন চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করে তখন তাকে বিরোধ অলংকার বলে।

১. ঘরের চোরে মারে ঘর
বসতের সুখ হয় কি তার
ভূতের কীর্তি তেমন প্রকার
এমন তার বসতখানা ॥[৫৯]

---

৫৫. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, বাঙলা অলংকার, কলিকাতা, ১৯৬৪ (৩য় সং.), পৃ. ৫৮
৫৬. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭
৫৭. লালন-জিজ্ঞাসা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭
৫৮. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৭
৫৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬

২. কিবা রে কুদরতি খেলা
জলের মাঝে অগ্নি-জ্বালা
খবর জানতে হয় নিরালা
নীরে ক্ষীরে আছে জ্যোতি॥[৬০]

'ঘরের চোরে মারে ঘর' এ উক্তিটি বিরোধমূলক হলেও দেহঘরে এ দু'টোর উপস্থিতি রয়েছে অঙ্গাঙ্গিভাবে। মানবদেহকে ঘর আর ষড়রিপুকে চোর ধরলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। আবার 'জল' ও 'অগ্নি' বিরোধ হলেও গভীরভাবে দেখলে মানবদেহে এ দু'টোর অবস্থান পাশাপাশি। তাই উপরোক্ত বক্তব্যে বিরোধ অলংকারের চমৎকার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

বিভাবনা

কারণ ছাড়া কার্যের উৎপত্তি হলে তাকে বিভাবনা অলংকার বলে।

১. মূল ছাড়া সে ফুলের লতা
ডাল ছাড়া তার আছে পাতা[৬১]

২. শুষ্ক নদীর শুষ্ক সরোবর
তিলে তিলে হয় গো সাঁতার[৬২]।

৩. আঠার মোকামে একটি রূপের বাতি জ্বলছে সদাই
নাহি তেল তার নাহি তুলা আজগুবি হয়েছে উদয়॥[৬৩]

এখানে 'মূল' ছাড়া বৃক্ষের ফুলের 'লতা' এবং 'ডাল' ছাড়া 'পাতার' কথা বলা হয়েছে। তাতে দেখা যায় কারণ ছাড়াই কার্যোৎপত্তির কথা আছে। সুতরাং এটি বিভাবনা অলংকারের উদাহরণ। অনুরূপভাবে 'শুষ্ক নদী' ও 'শুষ্ক সরোবর' কিভাবে জলে পূর্ণ হয়ে সাঁতার হয় এবং 'তেল তুলা' ছাড়া আঠারো মোকামে রূপের বাতি জ্বলে এগুলোর কোনো প্রসিদ্ধ কারণ আপাতত নেই। তথাপিও কার্য সম্পন্ন হয়। শুধু আলংকারিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়ে বিভাবনা অলংকারের সৃষ্টি করেছে।

বিশেষোক্তি

অতিশয় বা আধিক্য প্রতিপাদনের জন্য দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া ও জাতি যে স্থলে বৈকল্য প্রতীত হয় তাই বিশেষোক্তি অলংকার।

১. মুখে গুরু গুরু বলি
অন্তরেতে জুয়াচুরি—[৬৪]

২. পানির মধ্যে চাঁদ দেখা যায়
ধরতে গেলে হাতে কে পায়-[৬৫]

---

৬০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৯.
৬১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৯.
৬২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬.
৬৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫.
৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭.
৬৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১.

৩. ফাঁদ পাতিলাম শিকার বলে
ফাঁদ উঠিল আপন গলে।[৬৬]

উপরের চরণে মুখের কথার সঙ্গে অন্তরের তফাৎ বিস্তর বিধায় এখানে বৈকল্য প্রতীয়মান হয়েছে। তাই এটি বিশেষোক্তি অলংকার। অনুরূপভাবে 'পানির মধ্যে চাঁদ দেখা যায়', কিন্তু ধরা যায় না এবং নিজে শিকারের জন্য 'ফাঁদ' বসালেও সেই ফাঁদে নিজেই পড়ে যায়। সুতরাং এই যে বৈকল্যসমূহ যা বিশেষোক্তি অলংকারের দৃষ্টান্ত।

অসঙ্গতি

এক স্থানে কারণ থাকলে ও অন্যস্থানে কার্যোৎপত্তি হলে অসঙ্গতি অলংকার হয়।

১. মহাজনের ধন এনে
ছড়ালি তুই উলুবনে-[৬৭]

২. উপরওয়ালার সদর বাড়ি
আত্মরূপে অবতারি,
মনের ঘোরে চিনতে নারি
কিসে কি হয়॥[৬৮]

৩. যৌবন কালের কালে রঙ্গে দিলি মন,
দিনের দিনে হারালি পিতৃধন-[৬৯]

এখানে কারণ হচ্ছে 'মহাজনের' কাছে আর কার্য হচ্ছে 'উলুবনে'। অর্থাৎ মূল্যবান বস্তু নষ্ট হচ্ছে যত্রতত্র। এরূপ প্রেক্ষাপটে অসঙ্গতি অলংকারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আবার 'পরিশুদ্ধ আত্মা' 'পরমাত্মা'কে চিনতে পায়, কিন্তু এর বিভ্রম হলে তা সম্ভব হয় না। অনুরূপভাবে 'পিতৃধন' রক্ষার উপযুক্ত সময় হচ্ছে 'যৌবনকাল' কিন্তু কালের রঙ্গে মজে তা হারিয়ে যায় চিরতরে। এখানেও কার্য ও কারণের মধ্যে সমন্বয়হীনতা লক্ষ্য করা যায়। অতএব, এগুলো অসঙ্গতি অলংকারের দৃষ্টান্ত।

কারণমালা

কোনো কারণের কার্য যদি পরবর্তী কার্যের কারণ হয়ে পড়ে এবং এইভাবে কার্য-কারণ পরস্পর চলতে থাকে তাকে কারণমালা অলংকার বলে।

১. এই মানুষে হবে মাধুর্য ভজন,
তাইতে মানুষ রূপ এই গঠিল নিরঞ্জন,[৭০]

২. পূর্ণিমার যোগাযোগ হলে
শুকনা নদী উজান চলে
ত্রিবেণীর পিছল ঘাটে
নিঃশব্দে বন্যা ছোটে-[৭১]

মানুষ মানুষকে ভজন-সাধনায় আর ভালোবাসায় যেমন আবদ্ধ করেছে তেমনি স্বয়ং স্রষ্টা বা নিরঞ্জন মানুষকে ভালোবেসেই মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আবার পূর্ণচন্দ্রের উদয়ের সঙ্গে নদী বা সাগরের সম্পর্ক

---

৬৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২.
৬৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০.
৬৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫.
৬৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭.
৭০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২.
৭১. পূর্বোক্ত,পৃ. ১৭৫-১৭৬.

রয়েছে। আর এরই ফলে শুকনা নদীতে উজান বায় এবং ত্রিবেণীর পিছল ঘাটও প্লাবিত হয়ে যায়। এখানে দেহঘরের একটি কারণের সঙ্গে অন্য কারণগুলো জড়িত রয়েছে। আলোচ্য স্তবকে লালন এভাবেই উল্লেখ করেছেন, যা কারণমালা অলংকারের দৃষ্টান্ত পরিগ্রহ করে।

ব্যাজস্তুতি

স্তুতিচ্ছলে নিন্দা কিংবা নিন্দাচ্ছলে স্তুতি বুঝালে ব্যাজস্তুতি অলংকার হয়।

বিনা পাগালে গড়িয়া কাচি করছ নাচানাচি
মনে মনে ভাবছ বুঝি, কামার বেটারে আমি ঠকাইছি।[৭২]

এখানে স্তুতিস্থলে নিন্দা করা হয়েছে। এটি ব্যাজস্তুতি অলংকারের একটি দৃষ্টান্ত।

এছাড়াও লালনগীতি ইঙ্গিতধর্মী প্রবাদ-প্রবচন-সুভাষণের ব্যবহার তাঁর কাব্যগীতিকে আকর্ষণীয় করেছে।[৭৩] এরূপ কিছু প্রবাদ-প্রবচন-সুভাষণ :

ক. লোভে পাপ, পাপে মরণ,
খ. যজ্ঞের ঘৃত কুত্তায় খেলরে
গ. মনে মনে মনকলাটি খাও
ঘ. সুঁই ছিদ্রে চালায় হাতী,
ঙ. মারে মৎস না ছোঁয় পানি,
চ. কাক মারিতে কামান পাতা
ছ. ঘরের চোরে মারে ঘর
জ. হাতের কাছে হয় না খবর কি দেখতে যাও দিল্লি-লাহোর।
ঝ. পিড়েয় বসে পেঁড়োর খবর
ঞ. দীপ না জ্বালালে কি আঁধার যায়। ইত্যাদি।

লালনের গানে চিত্রকল্পের সুপ্রয়োগও লক্ষ্য করার বিষয় :

১. মাকাল ফলের বরণ দেখে
যেমন ডালে এসে নাচ কাকে।[৭৪]

২. মেঘের বিদ্যুৎ যেমন
লুকালে না পায় অন্বেষণ।
কালারে হারালাম তেমন
ঐরূপ হেরিয়ে এ স্বপনে॥[৭৫]

৩. এক নিরখে দেখ ধনি, সূর্যগত কমলিনী
দিনে বিকশিত কমলিনী, নিশিথে মুদিত রহে।
তেমনি যেন ভক্ত যে জনা এক রূপে বাধে হিয়ে॥[৭৬]

---

৭২. পূর্বোক্ত,পৃ. ১২৮.
৭৩. লালন সাঁইয়ের সন্ধানে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫.
৭৪. মুনশী আবদুল মাননান, লালন শাহ : বিবেচনা-পুনবিবেচনা, ঢাকা: গতিধারা, ২০০৫, পৃ. ৭৯.
৭৫. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৫
৭৬. লালন সাঁইয়ের সন্ধানে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪

উপরের উদ্ধৃত স্তবকসমূহে যথাক্রমে মাকাল ফলের টক্‌টকে লাল রঙ, মেঘাবৃত্ত আকাশ এবং পদ্ম ফুলের বিকশিত রূপ—এগুলো জীবন্ত। এসব চিত্রকল্প লালন গীতির প্রসাধনকলায় ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। এরকম চিত্রকল্প লালনের গানে পাওয়া যায়। যদিও শক্তিনাথ ঝা উল্লেখ করেছেন যে, ভাষার চিত্রধর্ম অপেক্ষা সংগীত ধর্মে লালন অধিক মনোযোগী ছিলেন।[৭৭] তথাপিও তাঁর গানে চিত্রকল্পের যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়।

ছন্দ

বাংলা ছন্দের ধারাবাহিক ইতিহাস না থাকলেও মধ্যযুগ থেকে শুরু করে এবং তার অব্যবহিত পর পর্যন্ত পয়ার আর ত্রিপদীই ছিল ছন্দের মূল বাহন। অবশ্য কবি ভারতচন্দ্রের হাতেই বাংলা ছন্দ যেন এক নিশ্চয়তায় উপনীত হলো। অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি প্রতিনিধি হিসেবে ভারতচন্দ্র যেমন ঐতিহাসিক উচ্চারণ, তেমন তাঁর রচনার সৌকর্য ও কারুকার্যকে স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘রাজকণ্ঠের মণিমালা’র সঙ্গে তুলনা করেছেন। অপর দিকে সাধক লালন শাহ লোক কবি এবং তাঁর রচনা স্বভাব-সুলভ সৌন্দর্যে অনবদ্য।[৭৮] আর ছন্দরীতি এবং গানের সৌন্দর্যবোধের প্রতি লক্ষ্য রেখে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যথার্থ মন্তব্য করেছেন :

> “সুরের সহিত গানগুলির ছন্দ ও মিলের সুন্দর সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। গানগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র-এক-একটি ভাব যেন ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুর-সংযোগে অভিব্যক্ত তাঁহার গানের অকৃত্রিম আবেগের মধ্যে একটা অনির্বচনীয়ত্বের বিদ্যুৎ খেলিয়া গিয়া আমাদের চিত্তকে অপূর্ব ভাবলোকে যেন উত্তীর্ণ করিয়া দেয়।”[৭৯]

কাঠামোগত দিক থেকে গানকে চারভাগে সাধারণত ভাগ করা যায় যেমন, আস্থায়ী (ধুয়া), অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। গানের ধুয়ায় মূলভাবের অবতারণা হয়। অন্তরাতে তারই বিবরণ, সঞ্চারীতে বিস্তার এবং আভোগে পরিসমাপ্তি ঘটে।[৮০] লালনের গানে দেখা যায়, আভোগে নামসহ ভণিতা ব্যবহৃত হয়েছে সচরাচর। ধুয়ার ক্ষেত্রে তাঁর যথেষ্ট সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। গানের অন্তরা, সঞ্চারী কিংবা আভোগে চরণান্তে মিলটি ধুয়ার সঙ্গে ছন্দের মিল রেখেই প্রবাহিত হয়েছে। এটি একটি অসাধারণ গুণ। এছাড়া লালনের গানগুলো যেমন দলীয়ভাবে গীত হয় তেমনি নৃত-গীতের উপযুক্ত ছন্দও তিনি মনের অজান্তেই নির্মাণ করেছিলেন। তাছাড়া বাউল আসরে গানের সঙ্গে নৃত্যের সংযোগ রয়েছে। দেহ দুলিয়ে ছোট ছোট পদ সঞ্চালনে এরূপ এক প্রকার ছন্দের সৃষ্টি হয় যা ‘বাউল ছন্দ’ বা ‘লালন-ছন্দ’ও বলা যায়। এ প্রসঙ্গে মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী উল্লেখ করেছেন—

> “বাউল সাহিত্যে গীত, বাদ্য ও নৃত্য এ তিন এর সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। বাউল গায়ক যখন গান করেন, একই সঙ্গে নৃত্য ও বাদ্য সহযোগে পরিবেশন করেন। প্রাচীন সংগীত শাস্ত্রে সংগীতের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে ‘গীত’ ‘বাদ্য’ ও ‘নৃত্য’—এই তিনের সমন্বয়ে সৃষ্ট রূপকে সংগীত বলে। যার সার্থক পরিচয় বাংলা গানের মধ্যে একমাত্র বাউল সংগীতে এখনও পাওয়া যায়। সুতরাং এদিক দিয়ে বাউল গান না বলে বাউল সংগীত বলাই সমীচীন। বাংলাদেশের এই দলের (বাউলদের) সবচেয়ে বড়গুণ হলো, বাঁ হাতে বাঁয়ার উপর তাল দিয়ে ডান হাতের এক আঙ্গুলে একতারার তালে তালে ঝংকার তুলে, পায়ে কাঁসার বাঁকা নুপুরের শব্দে নৃত্য ও একসঙ্গে গান গাওয়া।”[৮১]

---

৭৭. ফকির লালন সাঁই : দেশ কাল এবং শিল্প, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৬
৭৮. লালন-জিজ্ঞাসা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২-৯৩
৭৯. অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কলিকাতা : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ২য় সংস্করণ, ১৩৭৮, বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ১০৫
৮০. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬
৮১. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, লোকসঙ্গীত, ঢাকা : ১৯৯৯, পৃ. ৫১

ওয়াকিল আহমদ এ নৃত্যছন্দ সম্পর্কে আরো স্পষ্ট করেছেন—

"বাউল পুরুষের নাচ এবং প্রধানতঃ একক নাচ। আখড়ার মিলনোৎসবে দলবদ্ধ বাউল নাচ হয়ে থাকে। ক্লাসিক নাচের মুদ্রাভিনয় বাউলনাচে অনুপস্থিত। দেহ বা কোমরের কোন ছন্দভঙ্গি নেই, ডানহাতের একতারাটি কখন কানের কাছে চেপে ধরে, কখন প্রসারিত করে মৃদু টঙ্কারে বাজায়। তারা মিষ্টিক প্রেমের গান গায়; কিন্তু নৃত্যছন্দে সে ভাব ফুটিয়ে তোলায় আবশ্যক মনে করে না। বাউল নাচের সকল সৌন্দর্য ও মাধুর্য নিহিত আছে বিচিত্র ভঙ্গিতে পদচালনায় এবং গতিবিধিতে।"...[৮২]

আবার বাউলের মূলতত্ত্বের সঙ্গে গান ও নৃত্যের নিগূঢ় সম্পর্কে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী উল্লেখ করেছেন—

"...বাউলের নাচে ছন্দের বৈচিত্র্য আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে তালেরও বৈচিত্র্য—তাল ফেরতা আছে। ...বাউলের একতারা নৃত্যের ভঙ্গী, ভাবের উচ্ছ্বাস, সবই সামনে দেখে শুনে তবে বুঝতে হয়।"[৮৩]

বাউলদের নাচ-গানের নির্দিষ্ট সময় নেই। বিশষত গান তাদের সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ, আর নাচ এক্ষেত্রে অনুসঙ্গ মাত্র।

লালনের গানে যেমন ছন্দে অন্ত্যমিল রয়েছে তেমনি অন্তর্মিলও পাওয়া যায়। এরূপভাবে তাঁর গানে চরণ ও স্তবক রচনার নানা কলাকৌশলও তাঁর অসামান্য শিল্পীসত্তার প্রকাশ ঘটায়।

ছন্দের ক্ষেত্রে অন্ত্যমিলের একটা সহজাত আকর্ষণ থেকেই ধুয়ায় যে ধ্বনি বা অন্ত্যানুপ্রাস দিয়ে জোড়পদ রচনা করেন তা আবার অন্তরাদির শেষ চরণে, সঞ্চারীর শেষ চরণে এমনকি আভোগের শেষ চরণেও সেই ধ্বনি থাকে। ফলে ধুয়াটি পুন পুন গীত হয় যা ছন্দ ও সুরে এবং শিল্প- নৈপুণ্যে অনন্য। নিম্নে চতুরঙ্গের একটি পূর্ণাঙ্গ গানে সে পরিচয় পাওয়া যায়—

সাঁই আমার কখন খেলে কোন খেলা
জীবের কি সাধ্য আছে তাই বলা॥
　　কখনো ধরে আকার
　　কখনো হয় নিরাকার
　　কেউ বলে সাকার; আকার
　　অপার ভেবে হই ঘোলা ॥
অবতার অবতরী
সে তো সম্ভাব তারি
দেখ জগত ভরি
　　এক চাঁদে হয় উজালা ॥
ভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মাঝে
সাঁই বিনে কি খেল আছে
লালন কয়, নাম ধরেছে
　　কৃষ্ণ করিম কালা ॥[৮৪]

এখানে ছন্দরীতি : ধুয়া-কক, অন্তরা- খখখক, সঞ্চরী-গগগক এবং আভোগে- ঘঘঘক। আবার ছয় চরণ বিশিষ্ট অন্তরাতে অন্ত্যমিল ও অন্তর্মিলও লক্ষণীয়—

৮২. ওয়াকিল আহমদ, বাংলা লোকসাহিত্যে লোকসংস্কৃতির উপাদান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ডিসেম্বর ১৯৬৯, পৃ. ৮৩.

৮৩. উদ্ধৃত, সুকুমার রায়, বাংলা সংগীতের রূপ, কলিকাতা : ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিঃ, ১৯৯১ (পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ১২২.

৮৪. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৪.

অন্ধকার ধন্দকার
নিরাকার কুত্তকার
তারপরে হল হুহুংকার।
হুহুংকারের শব্দ হলো
ফেনারূপ হইয়া গেল
নীর গম্ভীরে সাঁই ভাসলেন নিরন্তর ৷৷[৮৫]

লালনের অন্য গানগুলোতে অন্ত্যমিলের চমৎকার মেলবন্ধন লক্ষ্য করার মত। এরূপ একটি গান নিম্নরূপ—

দেল-কেতাব খুঁজে দেখ রে মমিন চাঁদ;
তাতে আছে রে সকল বয়ান।
এব্রাহাম মসল্যা নামে আত্তা খাজুমে মোকাম ৷৷

খোদা যেদিন হজ ভেজিবে
সেদিন মজিদের নিশান উঠিবে
ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরতে হবে
যদি করে আল্লা মেহেরবান ৷৷
ইসা মুসা দাউদ রসুল
খোদার কাজে আছে মকবুল
ফরমান করিবে কবুল
পড়ছে সদায় চার কোরান ৷৷

ইঞ্জিল তেন্তরিত জব্বর ফোরকান
চারি জায়গায় চারের বয়ান
বলে সাঁই দরবেশ লালন
খুঁজে দেখলে পাবে রে সকল মন ৷৷[৮৬]

আধুনিক কালে বাংলা ছন্দের তিনরূপ যথা—অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত এ তিন ছন্দেরই নিদর্শন লালন গীতিতে পাই।

ক. **অক্ষরবৃত্ত**

বাংলা কাব্যে যেটি সনাতন ও সর্বাপ্রেক্ষা বেশি প্রচলিত রীতি, তার নাম পয়ারের রীতি। এই রীতি ছন্দকেই 'অক্ষরমাত্রিক' 'বর্ণমাত্রিক' 'অক্ষরবৃত্ত' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে এ রীতিতে মাত্রাসংখ্যা হরফ বা বর্ণের সংখ্যানুযায়ী নির্ণীত হয়। এছাড়া ধ্বনিবিজ্ঞান মতে সাধারণত প্রত্যেক Syllable বা অক্ষরকে একমাত্রা ধরা হয়। কেবল কোনো শব্দের শেষে হলন্ত Syllable বা অক্ষর থাকলে তাকে দুই মাত্রা এবং একটি বদ্ধাক্ষর একটি শব্দে পরিণত হলে দুই মাত্রা ধরে নির্ণয় করা হয়। পয়ার ধীর লয়ের ছন্দ।[৮৭] অক্ষরাবৃত্ত ছন্দের একটা বৈশিষ্ট্য যে এ ছন্দে কোনো অপূর্ণ পর্ব থাকে না। বদ্ধাক্ষর উচ্চারণে কখনো এক কখনো দুই মাত্রা হওয়ায় আবৃত্তিকালে এক ধরনের বিলম্বিত লয়ের সৃষ্টি হয়। এ ছন্দে নৃত্যচপলতা বা ক্ষিপ্রগতি কিংবা গা ঢালা আরাম আয়াসের ভাব আসে না। এজন্য অনেক উচ্চাঙ্গের কবিতা-গান পয়ারে রচিত হয়েছে। সাধক লালনের গানেও এ ছন্দের যথেষ্ট

৮৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৯.
৮৬. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৭.
৮৭. শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, বাংলা ছন্দের মূলসূত্র, কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২, (৬ষ্ঠ সং), পৃ. ৯৭

দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ ছন্দে শব্দান্তে অবস্থিত বদ্ধাক্ষর সর্বদাই দুই মাত্রা এবং শব্দের প্রথমে কিংবা মধ্যবর্তীতে বদ্ধাক্ষর একমাত্রা হবে।[৮৮] ৮ মাত্রার ছন্দ পয়ারে বেশি ব্যবহৃত হয়। বহুল প্রচলিত ৮+৬ মাত্রার ব্যবহার লালনের গানে রয়েছে। যেমন :

মুরশিদ জানায় যারে মর্ম | সেই জানিতে পায় ০০০ = ৮ + ৬

জেনে শুনে রাখে মনে| সে কি কারে কয় ০০০ = ৮ + ৬

মোহিতলাল মজুমদার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে পয়ারের মাত্রা সংখ্যা নির্দিষ্ট উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বলেছেন— 'এই রীতি ছন্দে কেবল ৮ মাত্রার নহে, ৫ মাত্রার, ৬ মাত্রার ৭ মাত্রার পর্বের ব্যবহারও...বিরল নহে।'[৮৯] নিম্নে একটি ৫ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় :

থাক না মন | একান্ত হয়ে = ৫+৫

গুরু গোসাঁইর | রাগ লয়ে॥[৯০] = ৫+৪

এছাড়াও লালন গীতিতে ৬ মাত্রার অক্ষরবৃত্তের ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায়।

কেনে ভ্রান্ত হও | রে আমার মন = ৬+৬

ত্রিবেণী নদীর | করঅন্বেষণা॥[৯১] = ৬+৬

লালন গীতিতে ৭ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত রয়েছে। লালন গীতির ছন্দ বিশ্লেষণে এরূপ উদাহরণ পাওয়া যায়। সুতরাং বিচিত্র অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার লালন গীতিতে রয়েছে।

মাত্রাবৃত্ত

যে ছন্দে বদ্ধাক্ষর (Closed syllable) সর্বত্রই দুই মাত্রা হিসেবে বিবেচিত হয় তাকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বলে।[৯২] মাত্রাবৃত্ত ছন্দের গতি বিলম্বিত। এখানে বদ্ধাক্ষর বা যগ্মধ্বনি সর্বদাই দুই মাত্রার। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে পর্বসংখ্যা নির্দিষ্ট নয়। এ ছন্দে যৌগিক অক্ষরের দীর্ঘীকরণ স্বভাবতই হয়ে থাকে এমনকি প্রয়োজনমতো মৌলিক স্বরান্ত অক্ষর দীর্ঘীকরণ হয়। মাত্রাবৃত্তে শ্বাসবায়ু পরিমাপের সূক্ষ্ম হিসাব রাখতে হয়।[৯৩] তাই ধ্বনি উৎপাদনে শ্বাসবায়ুর খরচ ও বাগযন্ত্রের কতটুকু আয়াস হলো তাও বিবেচনায় আনতে হয়। বিলম্বিত লয়ে উচ্চারণই এ ছন্দের প্রকৃতি। এ ছন্দে প্রতি চরণে একাধিক সমমাত্রিক পর্ব থাকায় একটা নির্ধারিত ছন্দের দোলা আছে এবং ছন্দের বদ্ধাক্ষর সর্বদা দুই মাত্রার হওয়ায় সেই দোলা বেশ ধীর লয়ের। লালনের অনেক গানে এ ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায় :

---

৮৮. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, বাংলা কবিতার ছন্দ, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৫ই আগস্ট, ১৯৭০, পৃ. ১৬।
৮৯. উদ্ধৃতি, লালন-জিজ্ঞাসা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫।
৯০. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২২।
৯১. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০।
৯২. এস.এম. আবদুল লতিফ, ছন্দ পরিচিতি, ঢাকা : আদিল ব্রাদার্স এ্যান্ড কোং, ১৯৭৭ (পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ), পৃ. ৯৬।
৯৩. বাংলা ছন্দের মূলসূত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫-১০৬।

ক. **স্বরমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ**

মুর্শিদ আমায় | চেতন করো গো = ৮+৮

পাপ ক'রে জঙ্গলে | গেলাম।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সমমাত্রিক পর্বে মাত্রা সংখ্যা ৫ ও ৬-এর সুপরিচিত দৃষ্টান্ত লালনের গানে পাওয়া যায় :

খ. **পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত**

যবন ছিল | দবীর খাস = ৫+৫

তারে গোসাঁই | পদ প্রকাশ

ক'রল গোরা | রায়— = ৫+২

গ. **ষান্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত**

প্রভুর যে মত | সেই মত সার = ৬+৬

আর যত সব | যায় ছারে খার।

ঘ. **সাতমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত**

দুগ্ধেতে ননীতে | মিলন সর্বদায় = ৭+৭

মৈথুন দণ্ডে | করে আলাদা তায়।

ঙ. **আটমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত**

মণি হারা ফণীর ম- | তন = ৮+২

প্রেম রসি- কের দু'টি | নয়ন

কি দেখে কি করে সেই | জন = ৮+২

কে তার অন্ত পায়।[৯৪]

লালনের গানে এরূপ অনেক বৈচিত্র্যপূর্ণ মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার আমরা দেখতে পাই।

---

৯৪. লালন-জিজ্ঞাসা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭

স্বরবৃত্ত

বাংলা ভাষায় আদিমতম ছন্দ হিসেবে স্বরবৃত্ত ছন্দ বিবেচিত হয়। এ ছন্দের মধ্য দিয়ে লোকচ্ছন্দ সৃষ্টি হয়েছে তা লোক-প্রতিভা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।[৯৫] এ ছন্দে প্রায় প্রত্যেক পর্বে শ্বাসাঘাত পড়ে। শাসাঘাতের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের একটা সচেষ্ট প্রয়াস থাকে এবং তা সুনিয়মিত সময়ান্তরে পুনঃপ্রবৃত্তি হয়ে থাকে। সাধু ভাষাতেও এ ছন্দের প্রচলন দেখা যাচ্ছে।[৯৬]

স্বরবৃত্ত ছন্দ সাধারণত প্রতি চরণে চারটি পর্ব এবং শেষের পর্বটি প্রায়ই অপূর্ণ থাকে। স্বরবৃত্ত ছন্দের তাল দ্রুত লয়ে চলে এবং বদ্ধাক্ষর সর্বদাই একমাত্রা হিসেবে বিবেচিত হয়। লালনের গানে এরূপ ছন্দের যথেষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় :

ক. **ত্রিপদী পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট স্বরবৃত্ত**

মাকড়সার আঁশে | হস্তী বাঁধা = ৪+৪

লোহার তারে | চেঁউটি ছেঁদা

কখন যায় | ছিঁড়ে।[৯৭] = ৪+২

খ. **চৌপদী পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট স্বরবৃত্ত**

গর্তে গেলে | কূপজল কয় = ৪+৪

গঙ্গায় গেলে | গঙ্গাজল হয়

মূলে একজল | (সে যে) ভিন্ন নয়

ভিন্ন জানায় | পাত্র-অনু | সারে।[৯৮] = ৪+৪+২

গ. **চতুর্মাত্রিক স্বরবৃত্ত**

কি করি কোন | পথে যাই | মনে কিছু = ৪+৪+৪
ঠিক পড়ে না।
দোটানাতে | ভাবছি বসে

ঐ ভাবনা॥[৯৯] = ৪

৯৫. আবদুল কাদির, ছন্দ-সমীক্ষণ, ঢাকা : মুক্তধারা, জুলাই, ১৯৭৯, পৃ. ১২১।
৯৬. বাংলা ছন্দের মূলসূত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭।
৯৭. শাজাহান ঠাকুর, বাংলা ছন্দের রীতি, রূপ ও বিকাশ, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫, পৃ. ১৩৩।
৯৮. পূর্বোক্ত,পৃ. ১৩৩।
৯৯. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১।

ঘ. **পঞ্চমাত্রিক স্বরবৃত্ত**

অনাদির আদি | শ্রীকৃষ্ণ নিধি = ৫+৫

তার কি আছে ক | ভু গোষ্ঠ খেলা॥

ব্রহ্ম রূপে সে | অটলে ব'সে

লীলাকারী হয় | তার অংশ কলা॥[১০০] = ৫+৫

ছন্দের নানারূপ উৎকর্ষ দেখে মনে হয় সত্যি সাধক বাউল কবি লালনের মনের অজান্তেই যেন ছন্দ এসে ধরা দিয়েছিল তাঁর সহজ-কবিত্ব শক্তির কাছে। ছন্দ সম্পর্কে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলেছেন :

'শরীরে স্বাস্থ্যের মতোই কবি ছন্দকে ভুলে থাকে ছন্দ যখন তার যথার্থ আপন হয়।'[১০১]

সুতরাং লালনের পথেই তাঁর গানগুলো সাধনার জগতকে প্রসারিত করেছে, গভীর আর সুতীক্ষ্ণ করেছে ভাবনার জগতকেও; জীবন-জগতের সকল যন্ত্রণার বেড়াজাল থেকে মুক্তির বারতা নিয়ে সর্বমানবের বেদনাকে অঙ্গীকার করে আমাদের প্রতিদিনের ভাবনা, অনুভাবনা, প্রেরণা, স্মৃতি-বিস্মৃতি একীভূত হয়ে জন্ম দিয়েছে অনিন্দ্যসুন্দর শিল্প। তাই লালন শুধু বাউল-সাধক নন বরং—

'লালন কবি, দার্শনিক, ধর্মবেত্তা ও প্রেমিক। তাঁর গান লোকসাহিত্য মাত্র নয়, বাঙালির প্রাণের কথা, মনীষার ফসল ও সংস্কৃতির স্বাক্ষর।'[১০২]

---

১০০. লালন গীতি সমগ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৩।

১০১.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছন্দ, কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থ প্রকাশ বিভাগ, আষাঢ়, ১৩৪৩, পৃ. ৫৯।

১০২.আহমদ শরীফ, বিচিত চিন্ড়া, ঢাকা : চৌধুরী পাবলিশিং হাউস, ২য় মুদ্রণ, নভেম্বর, ১৯৭৫, পৃ. ৪০৫.

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোর আলোচনার সাথে সাথে কতক প্রস্তাবিত বিষয়ও আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে চাই :

১. বাউল-ধর্ম একটি সমন্বয়মূলক ধর্ম। এতে শিবশক্তিবাদ, রাধাকৃষ্ণবাদ, বৈষ্ণব সহজিয়া তত্ত্ব, সুফি-দর্শন ও তত্ত্ব, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মতত্ত্ব এর সঙ্গে আরও কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়ে এ ধর্মমত তৈরি হয়েছে। পালবংশের রাজত্বকালে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম বিশেষ ব্যাপ্তি লাভ করে। এবং আস্তে আস্তে তা বাংলার অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের মানুষের প্রাণে ঢেউ তোলে এবং তারই ফলে বৌদ্ধ সহজধর্ম অধিক বিস্তৃতি লাভ করে। তবে সেনদের রাজত্বকালেও বৈষ্ণবধর্মের প্রসার ঘটে। কেননা সেনরা বৈষ্ণব মতালম্বী ছিলেন। হিন্দুদের শিবশক্তিবাদ পালযুগে বৌদ্ধদের প্রজ্ঞা-উপায়বাদের সহিত মিশে প্রকৃতি-পুরুষ রূপে রাধা-কৃষ্ণের কথা আসল। এবং বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবদের সম্প্রদায়গত তেমন কোন বড় ধরনের পার্থক্য না থাকায় সাধারণ মানুষ বৌদ্ধ সহজিয়া হতে বৈষ্ণব সহজিয়ায় পরিবর্তিত হয়ে পড়ল। এ বৈষ্ণব সহজ-সাধনা চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর নতুনরূপে প্রকাশিত হতে থাকে।[১]

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতেই বাংলায় মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। স্বভাবতই বিজয়ীরা বিজিতদের ওপর ধর্মীয় প্রভাবও বিস্তার করল। ফলে রাজধর্ম হিসেবে ইসলামের প্রসার ব্যাপকভাবে ঘটতে লাগল। কেননা সেন রাজত্বকালে কৌলিন্যপ্রথার সৃষ্টি হওয়ায় দেশের সাধারণ মানুষ বর্ণ-বৈষম্যকে গ্রহণ করতে পারেনি, তেমনি আর্য ব্রাহ্মণদের জীবনবাদকেও। ব্রাহ্মণবাদের কঠোরতম অধ্যাদেশে সাধারণ মানুষ শূদ্র অস্পৃশ্যগণ বরাবরই দুর্বল-অসহায় ও অবহেলিত হয়ে পড়লেন। তাই ইসলামের ঐশ্বর্য ও সাম্যের বাণী এসব অবহেলিত সাধারণ মানুষের কাছে পরম শান্তির পথ দেখালেন। এসব অসহায় মানুষ বিনা দ্বিধায় ইসলামের পতাকাতলে সমর্পিত হলেন।[২]

অবশ্য খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী হতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে বহু আরবীয় সাধু ও ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তি ইসলাম প্রসারের জন্য এ উপমহাদেশে আসেন। এমনকি আরবীয় বণিকও বাণিজ্যের ব্যপদেশে পূর্ব-পাকিস্তানে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতে লাগলেন।[৩] মধ্যযুগে বাংলাদেশে আগত বিভিন্ন তরিকার সুফিদের মধ্যে পীর-প্রথার উৎপত্তি দেখা যায়; তারই সমান্তরাল ধারায় ক্রমে ফকিরি মতেরই উদ্ভব ঘটে।[৪] আবার চৈতন্য দেবের সময় বৈষ্ণবধর্মে যোগ হয় আবেগ দীপ্ত প্রেম এবং তাঁর মৃত্যুর পর আনুমানিক ১৬২৫ খ্রীস্টাব্দের দিকে বাউল সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। এভাবেই মুসলমান ফকির ও হিন্দু বাউলেরা স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে নির্দিষ্ট আস্তানা কিংবা আখড়াতে মিলিত হয়ে তাদের ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব-সংকেত গানে গানে ব্যক্ত করত। গানই ছিল তাদের প্রধান অবলম্বন। সে হিসেবে বাউলধর্মের আবির্ভাবকাল সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে আরম্ভ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এর সৃষ্টি এবং ব্যাপ্তিকাল। অপরদিকে কাল-পরিক্রমায় উনিশ শতকে লালন ফকিরের হাতেই তা পূর্ণরূপ লাভ করে।

---

১. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলা বাউল ও বাউল গান, কলিকাতা : দীপান্বিতা, ২য় সংস্করণ, ১৩৭৮, পৃ. ১২৭.
২. গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশে সুফী সাধক, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৬, পৃ. ১৫.
৩. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, পূর্ব পাকিস্ড়নে ইসলাম, ঢাকা : আদিল ব্রাদার্স, ১৯৪৮, পৃ. ১৫.
৪. এস. এম লুৎফর রহমান, বাউল সাধনা ও লালন শাহ, ১৯৭৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপস্থাপিত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, পৃ. ২৩-২৪

২. মুঘল আমলের পতনের ফলে জাতীয় জীবনে সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের উপর কোম্পানি আমলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ-নির্যাতনের ভিত্তি রচিত হতে থাকে। এ সময় বর্ণনাতীত দুঃখ-কষ্ট আর নির্যাতনের ফলে সাধারণ মানুষ দিশাহারা হয়ে পড়েন। এরূপ একটি তমসাচ্ছন্ন পরিবেশ বাউলদের আন্দোলন এবং লালন তার পুরোধা। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে এসময় বাউলেরা কোন বলিষ্ঠ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি, তবে তাদের উদার মানবতাবাদ মানুষের ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে যেন শান্তির পরশ বুলিয়ে দিয়েছিল। অবশ্য এসময় রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামকৃষ্ণ দেব এবং ওহাবি-ফরায়েজি নেতারা ধর্ম-সংস্কারের নব্য অধ্যাত্মবাদ নামে প্রকারান্তে বর্ণবাদ কিংবা শাস্ত্রধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করতে প্রয়াস চালিয়েছেন। সেদিক থেকে জাতি-বর্ণ-ধর্ম-সম্প্রদায় নিরপেক্ষ লালনের বাণী সকলকেই মুগ্ধ করতে পেরেছিল; কেননা সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে মানুষের বিক্ষুব্ধ চিত্তকে বাউলেরা সান্ত্বনা ও তৃপ্তি দিয়েছিল। তাই লালন বেশিদিন অপ্রকাশিত থাকেননি, আখড়ায় হাজার হাজার ভক্তের সৃষ্টি হয়েছিল; তাঁর তাত্ত্বিক গান কুষ্টিয়া-যশোর ছেড়ে বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর, ফরিদপুর, ঢাকা, টাঙ্গাইল ও সিলেটসহ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল। একসময় তা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। আর সেই নানা জিজ্ঞাসায় আজও লালনের ব্যক্তিজীবন অনুসন্ধানী দৃষ্টিকে প্রতিনিয়ত তাড়িত করে চলছে। তাঁর একান্ত ব্যক্তিজীবনের কয়েকটি বিষয় আজও অমীমাংসিত রয়েছে-যেমন তাঁর জন্ম তারিখ, বৈবাহিক অবস্থা, জাত, রবীন্দ্র-লালনের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ ইত্যাদি।

এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে সে সময়ের প্রেক্ষাপটে জন্ম তারিখ নিবন্ধনের প্রথা না থাকায় সে বিষয়ে সঠিক তারিখটি জানার চেষ্টা সময়ক্ষেপণ মাত্র। তবে তিনি যে দীর্ঘজীবী ছিলেন এতে কারো কোন সন্দেহ নেই, সে হিসাব অনুযায়ী প্রচলিত জন্মতারিখের দু'এক বছর এদিক-সেদিক হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। লালনের স্ত্রীর ব্যাপারে মতবিরোধ যাই থাক তাঁর জীবনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমরা বলতে পারি তিনি অতি অল্প বয়সে বিবাহ করেছিলেন। বাল্যবিবাহের যে প্রথা ছিল, তা সহজেই অনুমেয়; লালনের অনেক পরে উচ্চশিক্ষিত সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র মাত্র দশ বছর আট মাসে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন।[৫] তবে লালনের স্ত্রী কিংবা মাতা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পাওয়া গেলে তাঁর পৈত্রিক জাত সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেত। জাতের ব্যাপারে আমরা এটুকু বলব, তিনি জন্মেছিলেন হিন্দুঘরে এবং দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন মুসলমান সাধকের কাছে এবং ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন মুসলিম-ধর্মে। তবে হিন্দু-মুসলিম কোন ধর্ম-দর্শন তাঁর প্রত্যাহিক জীবনাচারকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেনি, এমনকি মৃত্যুর পরও তাঁকে কোন ধর্মই স্পর্শ করতে পারেনি। কাজেই জাত-ধর্ম নিয়ে তাঁকে চিহ্নিত করার বৃথা চেষ্টা না চালানই কল্যাণকর। লালন-রবীন্দ্র সাক্ষাতের বিষয়টি নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে, তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গান, সুর, তত্ত্ব-দর্শন নিয়ে দেশে-বিদেশে আলোচনা করলেও কোথাও সাক্ষাৎ দেখা হয়েছিল এমন কোন কথা বলেননি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসংখ্য চিত্রকর্মে কোথাও লালন নেই। যাঁরা লালন-রবীন্দ্র প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের বিষয়টি নিশ্চিত করতে চেয়েছেন, পারেননি বরং তাঁদের কথা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়—'সে কালের এই দুজন কবির মধ্যে আলাপ-পরিচয় হয়েছিল কিনা তা নিয়ে ঐতিহাসিকরা আজও গবেষণা করছেন।'[৬] এক্ষেত্রে আমরা বলতে চাই লালন-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাক্ষাৎ 'ভবের হাটে' না হলেও 'ভাবের হাটে' ঘটেছিল। এছাড়াও ব্যক্তি লালনের চেয়ে তাত্ত্বিক-দার্শনিক লালন ছিলেন তাঁর কাছে অনেক বড়। তাঁর গানগুলোই এর বড় প্রমাণ।

৫. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, বঙ্কিম জীবনী, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, জানুয়ারী, ১৯৯১, পৃ. ২৫.
৬. শ্রী শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, পলণ্টীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা : ভাদ্র, ১৩৫২, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৫.

৩. বাংলার নবজাগরণে রামমোহন রায় যে অবদান রেখেছেন, সে প্রেক্ষাপটে লালনের গানগুলো বাংলার লোকমানসে মানবতাবাদের আন্দোলনেও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। শাস্ত্রধর্মকে গৌণ করে লালন মনুষ্যধর্মকেই প্রতিপালন করেছেন সর্বাগ্রে। শুধু তাই নয়, নারীর স্বাধিকার, স্বাধীনতার প্রসঙ্গ তাঁর তত্ত্বাশ্রয়ী গান উপেক্ষা করেনি বরং গূঢ়-গুহ্য তত্ত্বের বাইরেই যেন নারীর প্রতি আহ্বান—'কুলের বউ হয়ে মন আর কত দিন থাকবি ঘরে/ ঘোমটা ফেলে চল না রে যাই সাধবাজারে'। উনিশ শতকের অন্তঃপুর নিবাসী নারীমুক্তি আন্দোলনের এ এক মহামন্ত্র। বর্তমান বিশ্বে যে লিঙ্গ-সমতার আন্দোলন চলছে অনিবার্যভাবে সাধারণ মানুষের মাঝে এর সার্থক দাবিদার লালনও। লালন ভাবনায় ধ্বনিত হয়েছে নিষ্কলুষ জীবনের প্রতিচ্ছবি। চৌরাশি যোনি পার হয়ে তবেই মানবজন্ম, এ হেলাফেলার বিষয় নয়। লালন জীবনকে মোহমুক্ত করতে চান, তাই দ্বিতীয়বার আসার আর প্রয়োজন নেই। এজন্য বাউল ও লালন-দর্শন কামকে নিয়ন্ত্রিত করে চলতে থাকে এবং এক পর্যায়ে সন্তান উৎপাদন নিষেধ; পুরুষের শুক্রাণু এবং স্ত্রীর ডিম্বাণুর প্রকৃষ্ট ব্যবহার করতে চায় তাতে আয়ু বাড়ে জীবনীশক্তি অক্ষয় থাকে। এরূপ পরিশুদ্ধ হিসাব-নিকাশ জন্মনিয়ন্ত্রণেও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। অবশ্য এসব বিষয়ে গুরুর পরামর্শ প্রয়োজন হয়। এ দর্শনে গুরুর যে ভূমিকা, তাতে আধুনিক জগতে নেতৃত্বের (leadership) প্রসঙ্গ আসে। অনুসারীদেরকে অবশ্যই তার কথা মানতে হবে; আবার এ নেতাকেও অনুসারীদের যোগ্য হতে হবে। বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ছাড়া কোন জাতিই অগ্রসর হতে পারে না। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সকল ক্ষেত্রে এ নেতৃত্বের কথা আসে। লালনের গানে আটপৌরে জীবনের কথা আছে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গ কম নয়।

লালনের সমাজতাত্ত্বিক ধারণায় তাঁর ঈপ্সিত সমাজের জন্য উৎকণ্ঠাও কম নয়; ঘুণে-ধরা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে বিষবাষ্প উড়ছিল তা তিনি নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তৎকালীন রাষ্ট্রীয় জীবনেও যে কতটুকু অস্বস্তিকর পরিবেশ বিরাজ করছিল, তাও তিনিও উল্লেখ করেছেন 'এ দেশেতে এই সুখ হলো আবার কোথা যাই না জানি'। কাজেই লালন শুধু তাত্ত্বিক-ভাবুক নন বরং কালের ইতিহাসে তাঁর গানগুলো ঐতিহাসিক সাক্ষ্য বহন করে চলছে। কেননা গানগুলোতে সামষ্টিক জনতার কথা, সমাজের মঙ্গল চিন্তা, শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব-সংঘাত পরিহারেরও সুপরামর্শ বিদ্যমান। বিচিত্র বিষয় নিয়ে তাঁর গানগুলো আপন স্বকীয়তায় উদ্ভাসিত।

৪. কোন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের সাধনা লালন করেননি। বরং তিনি ছিলেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে। ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন, এমনকি বিশ্বে ধর্ম-সম্প্রদায়ের নামে রক্তের হলিখেলা চলে, তাও তাঁর অনুভবের সীমানায় ধরা দিয়েছে। তাই তিনি ধর্মের গোঁড়ামি মানেন নি। বরং তাঁর সঙ্গীত সাধনা হয়ে উঠেছিল আরাধনা আর মানবকল্যাণে নিবেদিত বিশ্বভ্রাতৃত্ব। লালন তথা বাউলদের এ যেন এক নীরব অভিযাত্রা। এ প্রসঙ্গে ড. মুহম্মদ এনামুল হক যথার্থই উল্লেখ করেছেন—

> ..."তাহাদের ভাবজাগতিক বিজয় অভিযানের সম্মুখে কোরান, পুরাণ, বেদ, বাইবেল দাঁড়াইতে পারে নাই; মুহম্মদ, যীশু, কৃষ্ণ, চৈতন্য পথ ছাড়িয়া দিয়াছেন।"[৭]

তাই ফোঁটা-তিলক, টিকি-টুপির বাহ্যিক ভড়ংকে পরিহার করে শুধুমাত্র মানুষ-তত্ত্বের উদার আহ্বান জানিয়েছেন লালন তাঁর গানে—

মানুষ তত্ত্ব যার সত্য হয় মনে
সেকি অন্য তত্ত্ব মানে ॥

৭. মুহম্মদ এনামুল হক- বঙ্গে সূফী প্রভাব, ঢাকা : র‍্যামন পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি, ২০০৬, পৃ.১৩৯-১৪০.

কিন্তু নির্মম হলেও সত্য আজও পৃথিবীতে 'মানুষ-তত্ত্ব' প্রতিষ্ঠিত হয়নি। দেশে-দেশে, রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে দ্বন্দ্ব-সংঘাত অব্যাহত রয়েছে। শোষকদের খোলস পাল্টেছে বটে কিন্তু শোষণের মাত্রা ঠিক আগের মতই রয়ে গেছে।

ধর্ম নয় বরং লালন তাঁর তত্ত্ব-দর্শনে মানুষকে শ্রেষ্ঠ করে দেখেছেন। তাই ধর্মের নামে উগ্রবাদীরা (হিন্দু ও মুসলিম উভয়ই) তাঁকে প্রতিহত করার নানা ষড়যন্ত্র করেছিল, ইতিহাসে সে তথ্যও কম নয়।

নানা দোষে লালন আজও আক্রান্ত; লালনের জীবদ্দশায় তা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। এখনও লালন ঘরানার বাউল, সাধক, পাগল, দরবেশ, ভক্ত, শায়েক, মায়েশ সবাই সামাজিকভাবে একঘরে; শরিয়তি ফতোয়ায় বড় নাজেহাল এ সম্প্রদায়। মাঝে মাঝে তাঁদের মাথার বাবরি চুল কেটে দিয়ে, একতারা কেড়ে নিয়ে তওবা পড়িয়ে মুসলমান বানানো প্রচেষ্টা আজও অব্যাহত। ফলে অত্যন্ত বিছিন্নভাবে সম্প্রদায়ের ক্ষয়িষ্ণু ধারা খুঁড়ে খুঁড়ে চলছে। মানুষের আর্থ-সামাজিক চাহিদা এত বেড়ে গেছে যে এ পথের পথিক মেলা ভার। কিন্তু তারপরেও রং- বেরঙের বাউল গ্রাম-শহর-বন্দরে দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে অনেকে নিজেকে গর্ব করে পরিচয় দেয়—আমি বাউল। যে বাউল সম্প্রদায় বর্ণ-শ্রেণিকে পরিহার করেছে অথচ আজ বাউলের নানা শ্রেণিকরণ—নগর বাউল, সৌখিন বাউল, মেকি বাউল, ভণ্ড বাউলও বটে। এদের ব্যাপারে প্রাজ্ঞ লালনের মন্তব্য :

> মদন-রসে মগনা
> তোর কথায় দৈন্য
> কাজে শুন্য

লালন বলে স্বভাব-গুণে হলি রে তুই বেজাতীয়ে ॥

তারপরেও লালন-দর্শন অসংখ্য মানুষের পরম আশ্রয় হিসেবে গড়ে উঠেছে। আজও লালন ঘরানার কিছু মানুষ সারাদিন শ্রান্তদেহে সন্ধ্যায় একত্রিত হয়ে সাঁইজির গানের মাহাত্মে নিজেদেরকে ঋদ্ধ করতে চায়, চায় জাগতিক জীবনের সমস্ত শোষণ বঞ্চনাকে কিছুক্ষণের জন্য ভুলে থাকতে। তারা নিজেদের মধ্যে নিয়ম করে মুষ্ঠির চাল (এক মুঠো চাল) উঠিয়ে সপ্তাহের এক নির্দিষ্ট দিনে লালনের গানের আয়োজন করে। এরূপভাবে গ্রাম-গঞ্জে বিভিন্ন তরিকাপন্থী সম্প্রদায় লালনের গান গেয়ে নিজেদেরকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করে, যাদের শতকরা নব্বই জন অশিক্ষিত মানুষ। এরাও কখনো কখনো দোল পূর্ণিমায় ছেঁউড়িয়াতে যায় তাদেরও গুরু কিংবা পীরের সঙ্গে কিংবা কোন মহতের সঙ্গে। তাঁদের এ পথে নতুন কেউ আসলে গুরু বা পীরের নির্দেশ অনুযায়ী সাধুসঙ্গ হয় এখানে; নতুনকে তাদের কিছু নিয়মানুযায়ী গ্রহণ করা হয়। তারপর রাতভর চলে সাঁইজি লালনের গান। বিচ্ছিন্ন হলেও লালন অনুসারী মানুষের সংখ্যা আজ নেহাত কম নয়। কেননা যুগ-চাহিদার সাযুজ্যে তাঁর গান যে মৌলিক চিন্তা- চেতনার জগতে আলোড়ন তুলেছে তা ভারতীয় উপমহাদেশের গণ্ডী অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে। বহির্বিশ্বে লালন চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, কেননা তাঁর দর্শন-সুধা মানুষের হৃদয়ে সঞ্জীবনী শক্তির আধার।

৫. 'বিদেশীর প্রেম কেউ করো না' যদিও লালন রূপকের আড়ালে এরূপ উচ্চারণ করেছিলেন কিন্তু উল্টো তাঁর প্রেমে বিদেশিরা পড়েছেন। তত্ত্ব-দর্শনের বাইরে লালনের গানের শিল্প-সৌন্দর্য মানুষকে সহজেই আকৃষ্ট করে। ইতোমধ্যে প্রায় ডজনখানেক ভিন্নদেশি পণ্ডিত-গবেষক লালনের দর্শন-তত্ত্বের প্রেমে লালনকে নতুনভাবে আবিষ্কারের চেষ্টায় রত আছেন। তাঁদের মধ্যে Dusan Zbavitel, Edward C. Dimock, June Mcdaniel, Charless H. Capwell, Josef Kuchertz, Masayuki O, Onishi, Carol Salomon, Father Marino Rigon প্রমুখ। এছাড়া জাতিসংঘ কর্তৃক (২৫ নভেম্বর, ২০০৫) বাউল গানকে 'a masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity.' হিসেবে ঘোষণা করেছে। এখন লালনের গান-সুর-তত্ত্ব-দর্শন ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর নানা দেশে। জাতি হিসেবে এ আমাদের গৌরবের বিষয়।

৬. 'জেনে শুনে সোনা ফেলে মন মজালাম রাঙ পিতলে'। লালনের এরূপ তাত্ত্বিক উচ্চারণে আমরা একমত। কেননা অদ্যাবধি লালনের গানগুলোকে উদ্ধার করা যায় নি। যতটুকু উদ্ধার হয়েছে তা পর্যাপ্ত নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনসুর উদ্দীন, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সহ আরো অনেকে লালন-গীতি সংগ্রহের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে লালন-সংক্রান্ত ধূম্রজাল অপসারিত হয়নি। অর্থাৎ সংগ্রহ পদ্ধতিটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে না হওয়ায় এ দশা।[৮] এজন্য কোনটি লালনের আসল গান এবং তার সংখ্যাই বা কত তা নির্ণীত হয়নি। যার ফলে ভবিষ্যতের গবেষক, শ্রোতা, পাঠক কিংবা লালনভক্ত-অনুসারীদের জন্য কোন মৌলিক সংকলন আজও পাওয়া যায়নি। পাওয়া যায়নি লালন-জীবনী সংক্রান্ত বস্তুনিষ্ঠ তথ্য। অবশ্য মৌলিক পাঠ নির্ণয়ে অনেকে ডায়াক্রনিক ও সিনক্রনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে চান কিন্তু এগুলো এযাবৎ প্রাপ্ত গানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বাদ-বাকি গানগুলো আমাদের ধরা- ছোঁয়ার বাইরে, এ অপরাধের গুরুভার লঘু করার কোন উপায় নেই। এছাড়াও এ যাবৎকালে আবিস্কৃত গানগুলো সুর-ছন্দ ও উপকরণে ভিন্নতা গানের কথা এমন হয়— 'সে আর লালন এখানে রয়/থাকে লক্ষ যোজন ফাঁক রে।' গাবার সময় গাইতে শোনা যায়—'শিয়াল লালন একখানে রয়/থাকে লক্ষ যোজন ফাঁক রে।' অর্থাৎ গানের মর্মগত তত্ত্ব থেকে কিছুটা হলেও সরলীকরণ করা হয়েছে। যা কারো কাম্য নয়। এরূপ অসংখ্য উদাহরণ আখড়া থেকে শুরু করে শহুরে শিক্ষিত শিল্পী মহলেও বিদ্যমান। লালনের গানে একতারাই প্রধান বাদ্যযন্ত্র, যুগের চাহিদানুযায়ী আজ যান্ত্রিক অর্কেস্ট্রায় লালন-গীতি পরিবেশিত হয়, যা প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে, কিন্তু একতারা ছাড়া প্রকৃত সুর কি উঠে আসে। কারণ সুরের সঙ্গে মাটির সম্পর্ক রয়েছে, রয়েছে প্রকৃতির সম্পর্ক; লালনসংগীতও এর বাইরে নয়। সুরের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য রয়েছে, অনেক সময় তা গ্রহণ করার মত নয়। যেমন চারটি পর্যায়ে এ সংগীতের সুরের বিকৃতি ঘটে—

১. আখড়া কেন্দ্রিক সুর— খোদ লালন আখড়াতেও বিভিন্ন জনে ভিন্ন সুরে ও উপকরণে লালন গীতি পরিবেশন করে।

২. লালন ঘরানার সুর—যারা লালনকে নিজেদের সাধন-ভজনের একমাত্র পাথেয় মনে করে তাদের ক্ষেত্রেও সুর, উপকরণ ও কথায় রকমফের দেখা যায়।

৩. শিল্পীদের সুর—একেক সংগীত শিল্পী একেক স্টাইলে লালন-গীতি পরিবেশন করে।

৪. সৌখিনদের সুর—অনেকে সৌখিনতাবশত লালনগীতিতে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ও সুরের আমদানি করে তাতেও সুর-ছন্দ ও ভাষায় গরমিল দেখা যায়।

সুরকে সংরক্ষণের জন্য অদ্যাবধি মৌলিক কোন কাজ হয়নি; শুধু মাত্র স্বরলিপি করে রাখা হয়েছে সুরকে প্রবহমান করার কোন উদ্যোগ নেই। এখন পর্যন্ত কোনটি লালনের আসল সুর, তা নির্ণীত হয়নি। দেশভাগের পর লালন স্বভাবতই বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে চর্চা হতে থাকে। আমাদের মনে লালন-দর্শন-চিন্তা কিছুটা হলেও পরিবর্তন সাধিত করেছে। কিন্তু তারপরেও আমরা পিছিয়ে আছি। জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মননের প্রতীক হিসেবে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দুটি প্রতিষ্ঠান—ক. বাংলা একাডেমি, খ. শিল্পকলা একাডেমী। কেবল জাতীয় উদ্যোগে এ দুটো প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় লালন চর্চা-গবেষণা অনেক দূর এগিয়ে নেওয়া সম্ভব, কিন্তু আজও তা সম্ভব হয়নি। আমরা প্রস্তাবাকারে কতক মন্তব্য করতে পারি :

৭. ক. কুষ্টিয়া লালন একাডেমী, বাংলা একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমী ছাড়াও বিভিন্ন গবেষক ও সুধীজন লালনের গান বিভিন্নভাবে রেকর্ড করেছেন যেগুলো আর্কাভিং জরুরি। রেডিও বাংলাদেশ ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস বেশকিছু লালনের গান প্রবীণ বাউলদের কাছ থেকে ধারণ করেছেন; এছাড়া বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রধান লালন সংগীত শিল্পীদের গান ও সাক্ষাৎকার অডিও ও ভিডিওতে ধারণকৃত তা সংরক্ষণ এবং প্রচার করা যেতে পারে। এব্যাপারে বাংলা একাডেমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।[৯]

---

৮. ওয়াকিল আহমদ, লোককলা : তত্ত্ব ও মতবাদ, ঢাকা : বইপত্র, নভেম্বর ২০০৭, পৃ. ৮০

৯. শফিকুর রহমান চৌধুরী সম্পাদিত ফোকলোর সংকলন-৬২ (লালনতত্ত্ব), ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ. ১৫০

খ. বাংলা একাডেমি ও শিল্পকলা একাডেমী পৃথকভাবে কিংবা যৌথভাবে একটি প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে যেখানে আজকে লালনের গানগুলো সংগ্রহ করা যেতে পারে। যা ভবিষ্যতের জন্য গবেষণার বস্তুনিষ্ঠ বিষয় হয়ে উঠতে পারে।

গ. বাউল শিল্পী তথা এ সম্প্রদায়ের ওপর যেকোন হয়রানি বন্ধে সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

ঘ. আমাদের নতুন প্রজন্ম লালন সম্বন্ধে তেমন ওয়াকিবহাল নয়, তাদেরকে তাদের উপযোগী করে লালনকে পরিচিত করাতে হবে।

ঙ. লালন কোন ধর্মকেই ছোট করেননি বরং সব ধর্মের মূল বিষয় মানুষ, তাকেই তিনি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন; এ বোধ উগ্রবাদীদের চেতনায় আনতে হবে।

চ. আমাদের জীবনের প্রতি পরতে পরতে লালন তত্ত্ব-দর্শনকে অনুধাবন করার পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য উপযুক্ত নিষ্ঠা ও অধ্যয়ন প্রয়োজন।

ছ. লালনের গান বাঙালি জাতির নিজস্ব সম্পদ। এ সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আমাদের চিন্তা-চেতনাকে রাঙাতে হবে নতুন করে।

জ. লালনের গানগুলো বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে। এর স্বত্ব কিভাবে লালনচর্চাকে সমৃদ্ধ করতে পারে তা নিয়ে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ অতি প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৮. বাংলাদেশ পলিমাটির একটি উর্বর দেশ। এ উর্বর মাটিতে জন্ম নিয়েছে ভাবুক, তাত্ত্বিক, দার্শনিক, ওলি-আল্লাহসহ বড় বিদগ্ধজন। যাঁদের মধ্যে লালন একজন। পলাশীর অস্তমিত সূর্যের আঁধারে অনাহারে প্রায় দেড়কোটি মানুষ মারা যায়, ঘনবসতিময় গ্রাম জনশূন্য হয়, প্রায় এক তৃতীয়াংশ জমি হয়ে পড়ে অনাবাদি।[১০] লালনের জন্মের মাত্র ৪-৫ বছর পূর্বে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে এরূপ করুণ পরিণতি হয়েছে। এ পরিসংখ্যান লালনের জানার কথা নয়, তবুও জীবনের পাঠশালাতে এ সম্পর্কে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তিনি সামজ-সংস্কারক, নেতা, বিপ্লবী কোনটি নয়; বরং তিনি যে ফকির সহায়-সম্বলহীন, আর একমাত্র মানুষই ছিল তাঁর কাছে 'রতন'। এ 'রতন' সংগ্রহের কাজে তিনি ছিলেন নিবেদিত। আর নিবিষ্ট চিত্তে স্রষ্টাকে উপলব্ধি করেছেন সৃষ্টির মাঝে। সিদ্ধি-সমৃদ্ধ দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছেন মানুষই স্রষ্টার আর এক প্রেমময় রূপ। তাই ফকির লালন গেয়ে উঠেন—

> যে রূপে সাঁই আছে মানুষে,
> রসের রসিক না হলে কি পাবে তার দিশে।[১১]

সুতরাং হিংসা-বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ধ্বংস, অসাম্য পরিহার করে মানুষ ভজন-সাধনের মধ্য দিয়ে শান্তিময় গণতান্ত্রিক ধরিত্রী নির্মাণ সম্ভব। এর উপযুক্ত রসদ রয়েছে ফকির লালন শাহের গানের মধ্যে। আমরা তাঁর গানের তত্ত্ব-দর্শন ও শিল্প-সৌন্দর্যে বাঙালির প্রবহমান জীবনচেতনার মৌল আকাঙ্ক্ষাকে বক্ষে ধারণ করে প্রকাশিত হতে চাই বিশ্বসমাজে।

১০. কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ, (২য় সংস্করণ) ১৯৬৯, পৃ. ৪
১১. ওয়াকিল আহমদ, বাউল গান, ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, মার্চ, ২০০৬, পৃ. ১৮৯

গ্রন্থপঞ্জি

অন্নদাশঙ্কর রায়। *লালন ও তাঁর গান*, কলিকাতা, ১৩৮৭ (২য় সংস্করণ)

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য। *বঙ্কিম জীবনী*, কলকাতা, ১৯৯১

অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, কলিকাতা, ১৯৯০

আনিসুজ্জামান। *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, কলকাতা, ১৯৯১

আনোয়ারুল করিম। *বাউল কবি লালন শাহ*, কুষ্টিয়া, ১৩৭৩

———। *বাংলাদেশের বাউল*, ঢাকা, ২০02

———। *বাংলাদেশের বাউল সমাজ, সাহিত্য ও সংগীত*, ঢাকা, ২০০২

আবুল আহসান চৌধুরী। *লালন শাহ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯২ (পুনর্মুদ্রণ)

———। *লালন সাঁইয়ের সন্ধানে*, ঢাকা, ২০০৭

———। *লালন সাঁই*, ঢাকা, ২০০৯ (২য় সংস্করণ)

———। *লালন সাঁই ও উত্তরসূরী*, ঢাকা, ২০১১

———। *কাঙাল হরিনাথ : গ্রামীণ মনিষার প্রতিকৃতি*, ঢাকা, ২০০৮

ঐ (সম্পাদিত)। *লালন স্মারকগ্রন্থ*, বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৭৪

———। *রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯০

———। *কাঙাল হরিনাথ মজুমদার স্মারকগ্রন্থ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জানুয়ারি, ১৯৯৮.

———। *লালনসমগ্র*, ঢাকা, ২০০৯ (পুনর্মুর্দ্রণ)

———। *রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত* লালনের গানের পাণ্ডুলিপি, ঢাকা, ২০০৯

আবদুল ওয়াহাব। *বাংলাদেশের লোকগীতি : একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যায়*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮

———। *লালন-হাসান : জীবন-কর্ম-সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৯

ঐ (সম্পাদিত)। *মহাত্মা লালন : মানবতাবাদ ও সংগীত*, ঢাকা, ২০১১

আবদুল কাদির। *ছন্দ-সমীক্ষণ*, ঢাকা, ১৯৭৯

আবুল কালাম মঞ্জুর মোরশেদ। *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*, কলকাতা, ১৯৯৭

আসাদুজ্জামান আসাদ। *যশোর জেলার ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৮৯

আহমদ শরীফ। বাউলতত্ত্ব, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩

———। *বিচিত চিন্তা*, ঢাকা, ১৯৭৫ (২য় মুর্দ্রণ)

আহমেদ সাফায়েত। *ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কথা*, ঢাকা ২০১০

ইমাম আহমেদ। *লালনের গান : আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ*, ঢাকা, ২০০৯

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, কলিকাতা, নতুন সংস্ককরণ, ১৩৮৮

এম. এ রহিম। *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮

এম মতিয়ার রহমান ও মুহম্মদ আবদুল হাই ঢালী। *দর্শনের মূলনীতি*, ঢাকা, ২০০৯ (৩য় সং)

এস. এম. আব্দুল লতিফ। *ছন্দ পরিচিতি*, রাজশাহী, ১৯৯৪ (৪র্থ সং)

এস. এম. লুৎফর রহমান। *লালন-জিজ্ঞাসা*, ঢাকা, ২০05 (২য় সং)

———। *লালন শাহ : জীবন ও গান*, শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৬ (৩য় সং)

——————। বাউল তত্ত্ব ও বাউল গান, ঢাকা, ১৩৯৭

ঐ (সম্পাদিত)। *লালন গীতি চয়ন*, ঢাকা, ১৯৮৫

ওয়াকিল আহমদ। *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৭ (প্রথম পুনর্মুদ্রণ)

——————। *নজরুল লেটো ও লোক-ঐতিহ্য*, ঢাকা, ২০০১

——————। *লোককলা : তত্ত্ব ও মতবাদ*, ঢাকা, ২০০৭

ঐ (সম্পাদিত)। *বাউল গান*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০

——————। *লালন গীতি সমগ্র*, ২০০৫

——————। *বাংলা লোকসংগীতের ধারা*, ঢাকা, ২০০৬

——————। *বাংলা লোকসংগীতের ধারা ২য় খণ্ড*, ঢাকা, ২০১১

কাজী আবদুল ওদুদ। *শাশ্বত বঙ্গ*, কলিকাতা, ১৩৫৮

কাজী আবদুল মান্নান। *আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, ঢাকা, ১৯৬৯, (২য় সং)

ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী। *বাংলার বাউল*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯

খোন্দকার রফিউদ্দিন। *ভাব-সঙ্গীত*, যশোর, ১৯৭৪ (২য় সং)

খোন্দকার রিয়াজুল হক। *মরমি-কবি লালন শাহ : জীবন ও সঙ্গীত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯.

ঐ (সম্পাদিত)। *লালন মৃত্যু শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা, ১৯৯২

——————। *লালন সাহিত্য ও দর্শন*, ঢাকা, ২০০৩, (২য় সং)

গোলাম সাকলায়েন। *বাংলাদেশে সুফী সাধক*, ঢাকা, ১৯৯৬

জসীম উদ্‌দীন। *মুর্শীদা গান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭

——————। *বাউল*, ঢাকা, ১৯৯৯

জীবেন্দ্র সিংহ রায়। *বাঙলা অলংকার*, কলিকাতা, ১৯৬৪ (৩য় সং)

জুলফিকার নিউটন। *মরমী লালন ফকির*, ঢাকা, ২০০৮

জুলফিকার হায়দার। *বাংলার সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম*, ঢাকা, ২০০৪

তপনকুমার বিশ্বাস। *লোককবি লালন*, কলকাতা, ২০০৮

তৃপ্তি ব্রহ্ম (সম্পাদিত)। *লালন পরিক্রমা ১ম খণ্ড*, কলিকাতা, ১২৯৩

পবিত্র সরকার। *লোকভাষা লোকসংস্কৃতি*, কলকাতা, ১৯৯১

ফকির আনোয়ার হোসেন মন্টু (সম্পাদিত)। *লালন-সঙ্গীত (১ম খণ্ড)*, কুষ্টিয়া, ২০১১ (৫ম সং)

ফরহাদ মজহার। *সাঁইজীর দৈন্যগান*, ঢাকা, ২০০০

বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (সম্পাদিত)। *বাউল গান ও দুদ্দু শাহ*, বাংলা একাডেমী, ১৩৭১ (১ম সং)

ম. মনিরউজ্জামান। *সাধক কবি লালন : কালে উত্তর কালে*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১০

মহসিন হোসাইন। *বৃহত্তর যশোরের লোক কবি ও চারণ কবি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মাসুদ রেজা। *ফরিদপুরের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপরেখা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮

মুনশী আবদুল মাননান। *লালন শাহ : বিবেচনা-পুনর্বিবেচনা*, ঢাকা, ২০০৫

মুস্তফা মাসুদ। *যশোরের লোক সাহিত্য : ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

মুহম্মদ আবূ তালিব। *লালন শাহ ও লালন-গীতিকা, ১ম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮

মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান। *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ঢাকা, ১৯৯৫ (৭ম সং)

মুহম্মদ এনামুল হক। *মনীষা-মঞ্জুষা*, ঢাকা, ১৯৭৫

————————। *পূর্ব্ব-পাকিস্তানে ইসলাম*, ঢাকা, ১৯৪৮

————————। *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, ঢাকা, ২০০৬

মুহম্মদ কামাল উদ্দীন (সংকলিত)। *লালন গীতিকা*, ঢাকা, ১৯৭৭ (৩য় সং)

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন (সম্পাদিত)। *হারামণি (১ম খণ্ড)*, কলকাতা, ১৩৩৭

————————। *হারামণি, (লোকসংগীত সংগ্রহ), ৪র্থ খণ্ড*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৫৯

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ও মুহম্মদ আবদুল হাই (সম্পাদিত)। *হারামণি, ৫ম খণ্ড*, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৬৮

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন (সম্পাদিত)। *হারামণি ৭ম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮ (২য় সংস্করণ)

————————। *হারামণি ৮ম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, ঢাকা, ১৯৯৯ (২য় সং)

মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী। *লোকসঙ্গীত*, ঢাকা, ১৯৯৯

————————। *বাউল কবি লালন ও তাঁর গান*, ঢাকা ২০০৯

মোবারক হোসেন (সম্পাদিত)। *লালন সমগ্র*, ঢাকা, ২০০৭

মোমেন চৌধুরী। *লালন বিষয়ক রচনাপঞ্জি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫

মোহাম্মদ আকাম উদ্দীন। *বাউল সম্রাট লালন শাহ*, ঢাকা, ২০০১

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। *বাংলা কবিতার ছন্দ*, ঢাকা, ১৯৭০

মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী (সম্পাদিত)। *বাংলাদেশের লোকসংগীত পরিচিতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩

মোঃ সোলায়মান আলী সরকার, *লালন শাহের মরমী দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। *ছন্দ*, কলিকাতা, ১৩৪৩

রাখাল দাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙ্গালার ইতিহাস, কলিকাতা, ২০১০

রামেশ্বর শ। *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, কলকাতা, ১৪০৩ (৩য় সং)

শক্তিনাথ ঝা। *ফকির লালন সাঁই : দেশ কাল এবং শিল্প*, কলিকাতা, ১৯৯৫

ঐ (সম্পাদিত)। *বাউল-ফকির পদাবলী, ১ম খণ্ড*, হাওড়া, ২০০৯

শুদ্ধসত্ত্ব বসু। *অলংকার-জিজ্ঞাসা*, কলিকাতা, ১৯৬২

শাজাহান ঠাকুর। *বাংলা ছন্দের রীতি, রূপ ও বিকাশ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

শফিকুর রহমান চৌধুরী সম্পাদিত। *ফোকলোর সংকলন-৬২ (লালনতত্ত্ব)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

শ্রী অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। *বাংলা ছন্দের মূলসূত্র*, কলিকাতা, ১৯৬২

শ্রী কুমুদনাথ মল্লিক। *নদীয়া কাহিনী*, নদীয়া, ১৩১৯ (২য় সং)

শ্রী শচীন্দ্রনাথ অধিকারী । *পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ*, কলিকাতা, ১৩৫২

শ্রী সনৎকুমার মিত্র। *লালন ফকির : কবি ও কাব্য*, কলিকাতা, ১৩৮৬

ঐ (সম্পাদিত)। *বাউল-লালন-রবীন্দ্রনাথ*, কলিকাতা, ১৯৯৫

সুকুমার রায়। *বাংলা সংগীতের রূপ*, কলিকাতা, ১৯৯১ (পুনর্মুদ্রণ)

সুধীন দাশ। *লালনগীতি ও স্বরলিপি*, ঢাকা ২০০৭

সুধীর চক্রচর্তী। *লালন*, ঢাকা, ২০০৪

ঐ (সম্পাদিত)। *বাংলা দেহতত্ত্বের গান*, কলকাতা, ২০০০

সুব্রত রুদ্র। *লালনের গৌরগান*, কলকাতা, ১৯৯৩

সৈয়দ আকরাম হোসেন । *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, কলকাতা, ২০১১

হাবিবুর রহমান। *বাংলাদেশের লোকসংগীত ও ভৌগোলিক পরিবেশ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২

হুমায়ুন আজাদ (সম্পাদিত)। *আবদুল হাই রচনাবলী, ১ম খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

ইংরেজি গ্রন্থপঞ্জি

Abul Latif. *The Muslim mystic movement in Bengal (1302-1550)*, Calcatta, 1993.

David Cashin. *The Ocean of love : Middle Bengal sufi literature and Fakirs of Bengal*, The Association of Oriental Studies, Stockholm University, Sweden, 1995.

Dr. Muhammad Shahidullah. *Buddhist Mystic Songs,* Dhaka, 1st Mowla Brothers Edition 2007.

Enamul Haq. *A History of Sufi-ism in Bengal*, Dacca, 1975.

Samir Dasgupta. *Songs of Lalon,* Dhaka, 2000

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ

আবদুর রহমান। *যার আপন খবর আপনার হয় না, দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১ অক্টোবর, ২০১২.

আশরাফ সিদ্দিকী। *লালনগীতিতে শব্দ মটিফিম*, দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, ২৫শে পৌষ, ১৩৮৩.

————। *লালন শাহের গান, দৈনিক বাংলা*, ঢাকা, ৩রা কার্তিক, ১৩১৭.

এস. এম. লুৎফর রহমান। *লালন-অনুসারী কবিবৃন্দ*, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঊনবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৯২.

————। *বাউল মতবাদের সেকাল-একাল*, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঢাকা, সপ্তদশ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৯০.

ওয়াকিল আহমদ। *লালন সঙ্গীতে ধর্মীয় দর্শন*, বেতার বাংলা, ঢাকা, ভাদ্র দ্বিতীয় পক্ষ, অষ্টাদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৯৬.

————। *লালনের গানের পাঠ-সমীক্ষা*, সাঈদ-উর রহমান সম্পাদিত, সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, তেতাল্লিশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ১৪০৭.

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন। *শাহ লালন ফকিরের গান*, বঙ্গবাণী, ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩.

শ্রী মতিলাল দাস। *লালন ফকিরের গান*, বসুমতি, ১৩শ বর্ষ শ্রাবণ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৪১.

খোন্দকার রিয়াজুল হক । *বাংলা সাহিত্যের ধারায় লালন গীতি : ভাষা ও তত্ত্ববিচার*, বেতার বাংলা, ঢাকা, পঞ্চম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, ১৯৭৬.

মযহারুল ইসলাম। *পূর্ব-পাকিস্তানের লোক-কৃষ্টি, রেডিও পাকিস্তান*, ঢাকা, জুন, ১৯৬৮.

মনোয়ার হোসেন খান। *বাউল সম্রাট লালন শাহ, বেতার বাংলা, ঢাকা, পঞ্চম বর্ষ*, পঞ্চম সংখ্যা, ১৯৭৬.

হরেন্দ্র চন্দ্র পাল। *বাউল গানে 'বর্জখ' শব্দের অর্থ নির্ণয়*, আহমদ শরীফ সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ত্রয়োদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৭৬.

গবেষণা নিবন্ধ

এস. এম. লুৎফর রহমান-। *বাউল সাধনা ও লালন শাহ (পিএইচডি অভিসন্দর্ভ)*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৭৭.

ওয়াকিল আহমদ। *বাংলা লোকসাহিত্যে লোকসংস্কৃতির উপাদান (পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ)*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা, ১৯৬৯.

মো. সাঈদুর রহমান। *বাংলাদেশে সুফীবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ)*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০৯.

অভিধান

আহমদ শরীফ (সম্পাদিত)। *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (সম্পাদিত)। *পূর্ব-পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*, বাঙলা একাডেমী, বর্ধমান হাউস, ঢাকা, ১৯৬৫।

কাজী রফিকুল হক (সম্পাদিত)। *বাংলা ভাষায় আরবী, ফারসী, তুর্কী, হিন্দী, উর্দু শব্দের অভিধান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৪।

সাক্ষাৎকার

১. আব্দুর রশিদ বাউল, পিতা : মৃত হুরমত আলী শেখ, গ্রাম : বাগুলাট, ডাকঘরঃ মধুপুর, উপজেলা : কুমারখালী, জেলা : কুষ্টিয়া। বয়স : ৬৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : সামান্য। সাক্ষাতের সময় : রাত ১০.০০টা, ১৮ মে, ২০১২, স্থান : লালন অডিটোরিয়াম, ছেঁউড়িয়া।

২. ডা. ওয়াসিম উদ্দীন (খেলাফতধারী পীর, চিশতিয়া তরিকা), পিতা : মৃত আবদুল হাকিম সরকার, গ্রাম : সপ্তগোয়া, উপজেলা : সরিষাবাড়ি, জেলা : সরিষাবাড়ি, সাক্ষাৎকারের সময় : বিকাল ৪.০০টা, ৯ জানুয়ারি, ২০১২, স্থান : ঢাকা।